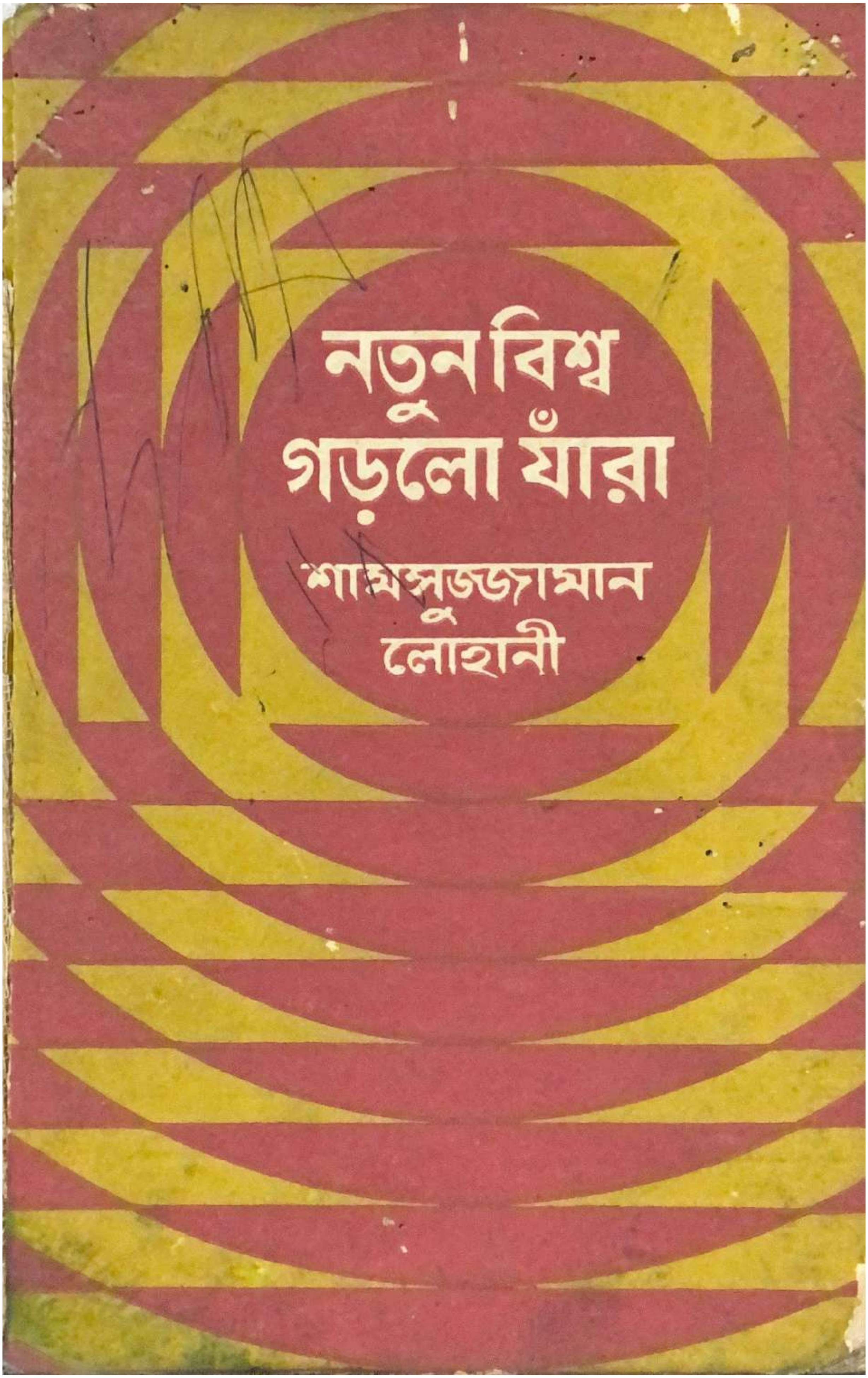

নতুন বিশ্ব গড়লো যাঁরা

শামসুজ্জামান লোহানী

নতুন বিশ্ব গড়লো যাঁরা

শামসুজ্জামান লোহানী

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়, ১৩৮৮
[জুন, ১৯৮১]

বাএ/১১১৯
মুদ্রণ সংখ্যা : ৩২৫০ কপি

পাণ্ডুলিপি
অনুবাদ বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশনায়
আল-কামাল আবদুল ওহাব
পরিচালক
প্রকাশন-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণে
মানিক লাল শর্মা
মনোরম মুদ্রায়ণ
২৪, শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১

প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কণে
মোঃ ইদ্রিস

মূল্য : পনের টাকা

NOTUN BISWA GARLO ZARA : by Shamsuzzaman Lohani.
Published by Bangla Academy, Dacca, First edition, June, 1981.
Price : Taka 15·00 only.

সূচীপত্র

আর্কিমিডিস	১
গ্যালিলিও গ্যালিলী	১০
উইলিয়াম হার্ভে	২১
এনথনী লিউএন হুক	৩০
স্যার আইজ্যাক নিউটন	৩৮
স্প্যালানজানি	৪৯
জোসেফ প্রিস্টলী	৫৬
এন্টনী লরেন্ট ল্যাভয়শিয়ে	৬৭
মাইকেল ফ্যারাডে	৭৫
চার্লস রবার্ট ডারউইন	৮৬
স্যার জেমস্ ইয়ং সিমপ্‌সন	৯৭
লুই পাস্তুর	১০৬
লর্ড লিস্টার	১১৬
আলবার্ট আইনস্টাইন	১২৩
অধ্যাপক হলডেন	১৩১

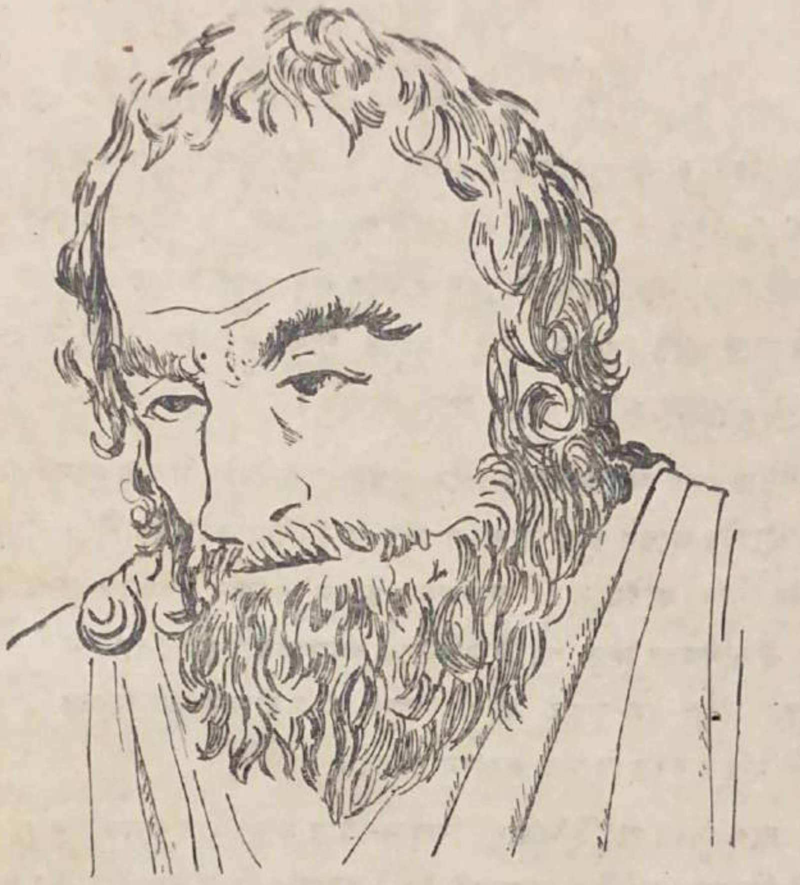

আর্কিমিডিস

"ইউরেকা ! ইউরেকা ! অর্থাৎ—পেয়েছি ! পেয়েছি !" বলে চিৎকার করে একজন লোক ছুটে চলেছেন। কোন দিকে তাঁর খেয়াল নেই। কি আশ্চর্য ! নগ্ন দেহেই তিনি ছুটে চলেছেন। তবে, লোকটা কি পাগল ? স্তম্ভিত হয়ে গেছে আশে-পাশের লোকজন। থম্‌কে দাঁড়ালো পথযাত্রীরা ! রাজপথ দিয়ে গরু-ঘোড়া-গাড়ী কোন কিছুই আর চলছে না। যে যেখানে ছিল সে সেখানেই অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলো ! কারও মুখে কোন কথা নেই। কিছুক্ষণ পরে, মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠলো। কেউ কেউ বললো—কে এই লোক ? ভেজা নগ্ন গায়ে কে এমন উন্মাদের মত ছুটে চলে গেল ?

অনেকেই জটলা করছে। একই প্রশ্ন সবার মুখে। লোকটি কে ? তারপর কে যেন কানে কানে লোকটির নাম বলে গেল। শুনে ত' সবাই অবাক আর্কিমিডিস ! এত বড় নামডাক যাঁর—একি কাণ্ড করলো সে ! অন্য

কেউ হলে ত' সবাই মিলে তাকে পাকড়াও করতো—পাগল ক্ষেপেছে—মাথায় ছিট্ হয়েছে—এইমত কত শত কথা বলে তার চিকিৎসার তোড়জোড় চলতো। কিন্তু এঁর বেলায় তা' কেউ করলো না। অনেকেই মন্তব্য করলো, লোকটি হয়ত নতুন কিছু আবিষ্কার করেছেন, তাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে এমনিভাবে ছুটে গেলেন। এই মুহূর্তে পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁর খেয়াল নেই। নতুনের আনন্দ তাঁকে পেয়ে বসেছে।

ইনিই সেই আর্কিমিডিস—সে-যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও অঙ্কের যাদুকর। যীশু খ্রীস্টের জন্মের দু'শ সাতাশি বছর পূর্বে সিরাকিউয নগরীতে তাঁর জন্ম। পিতার নাম ফাইডাস্। ফাইডাস্ ছিলেন একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য আর্কিমিডিসকে আলেকজান্ড্রিয়ায় পাঠান। আলেকজান্ড্রিয়া ছিল সে-যুগের গ্রীক শিক্ষা ও সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। এখানে আর্কিমিডিস বছর তিনেক অধ্যয়ন করেন।

দেশে ফিরে আর্কিমিডিস বিজ্ঞান-চর্চায় মনোনিবেশ করলেন। মূলতঃ তিনি ছিলেন গাণিতিক, অঙ্ককেই তিনি মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন! চমক্প্রদ কোন কিছু আবিষ্কার করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তাই, দিনরাত বসে বসে শুধু অঙ্কই কষ্‌তেন আর জ্যামিতি আঁকতেন। তিনি বলতেন, যে জিনিস অঙ্ক কষে প্রমাণ করা যায়—তার চেয়ে খাঁটি প্রমাণ আর কিছু হতে পারে না। বলা বাহুল্য আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতামতও এইরূপ। তাই, আমরা অনায়াসেই আর্কিমিডিসকে আধুনিক বিজ্ঞানের পয়লা পথ-নির্দেশক বলতে পারি।

সে সময় হিরো ছিলেন সিরাকিউয নগরীর রাজা। তাঁর ছেলের নাম ছিল গেলো। এঁদের দু'জনার সাথেই আর্কিমিডিসের বন্ধুত্ব ছিল। রাজা তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, প্রায়ই তাঁর জ্ঞান-গরিমার তারিফ করতেন। মাঝে মাঝে রাজা হিরো আর্কিমিডিসকে এটা-ওটা কাজ দিতেন, আর আর্কিমিডিসও সে-সব কাজ সমাধান করে তা' ঠিক ঠিক সময়মত বুঝিয়ে দিতেন ফলে, রাজা আরও বেশী অভিভূত হতেন তার জ্ঞানের অসীমতা দেখে।

একবার একটা জিনিস নিয়ে রাজার মনে বড় সন্দেহ হলো। কোন এক স্বর্ণকারকে একটা সোনার মুকুট তৈরী করতে দিয়েছিলেন তিনি। যথাসময়ে স্বর্ণকার মুকুট তৈরী করে দিল—সুন্দর ঝকঝকে মুকুট। হঠাৎ রাজার মনে হলো, আচ্ছা, স্বর্ণকার ত' সোনা চুরি করে এর সাথে কিছু অন্য কোন ধাতুও মেশাতে পারে; কিন্তু মুকুটটি না ভেঙ্গে এটা পরীক্ষা করা যায় কি করে। সাথে সাথে তিনি আর্কিমিডিসকে ডেকে পাঠালেন। সে ছাড়া রাজ্যে এমন কেই-বা আছে যে, এমন জটিল প্রশ্নের সঠিক সমাধান দিতে পারে। তাই রাজা হিয়েরো আর্কিমিডিসের উপর এ সমস্যা সমাধানের ভার অর্পণ করলেন।

আর্কিমিডিস পড়লেন মহা বিপদে। বড় কঠিন কাজ। অথচ এর একটা সমাধান খুঁজে বের করতেই হবে। তিনি গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন, শুধু ভেবে চললেন, কি করে এই জটিল সমস্যার সমাধান করা যায়। এমনি ভারাক্রান্ত মনে একদিন তিনি গোছলখানায় হাজির হলেন, গোছলের জন্য। পানির চৌবাচ্চাটি ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। আর্কিমিডিসের মনে তখনও সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে—কি করে বের করবেন তিনি স্বর্ণ মুকুটের নির্ভেজালতা। তিনি চৌবাচ্চার মধ্যে নামলেন, আর সাথে সাথেই টল্‌কা খেয়ে চৌবাচ্চার উপর দিয়ে কয়েক আঁজ্‌লা পানি উপচিয়ে পড়লো। এমন ঘটনা তো কতই না ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু পানি উপচিয়ে পড়তে দেখে আর্কিমিডিস হঠাৎ যেন কিসের একটা সূত্র খুঁজে পেলেন। আর আমনি তড়াক করে পানির পাত্র থেকে নেমেই ভেজা গায়ে—নগ্ন অবস্থায় রাজপথ দিয়ে দৌড়াতে লাগলেন এবং চিৎকার করে ঘোষণা করলেন, ইউরেকা! ইউরেকা! অর্থাৎ—পেয়েছি! পেয়েছি!

তাঁকে আর পায় কে? গৃহে ফিরে সাথে সাথেই বসে গেলেন হাতে-কলমে তা পরীক্ষা করতে। সত্যসত্যই একটা সূত্রও আবিষ্কার করলেন, কোন বস্তু পানিতে ডুবলে তার ওজন কিছুটা কমে যায়। আর এই ওজন হ্রাসের পরিমাণ ওই বস্তু কর্তৃক অপসারিত পানির ওজনের সমান।

তারপর, তিনি ছুট্‌লেন রাজার কাছে। সেখানে পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন যে, মুকুটটি সম্পূর্ণ খাঁটি সোনার নয়। আহা, বেচারা স্বর্ণকার! ভেজাল দেওয়ার অপরাধে তার ভাগ্যে যে কি শাস্তি জুটেছিল তা' সহজেই অনুমান করা যায়। আর এই ক্ষুদ্র পরীক্ষা থেকে আর্কিমিডিস যে-সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করলেন, এটিই তাঁর জল-গণিতের বিখ্যাত সূত্র হিসেবে আজও স্বীকৃত।

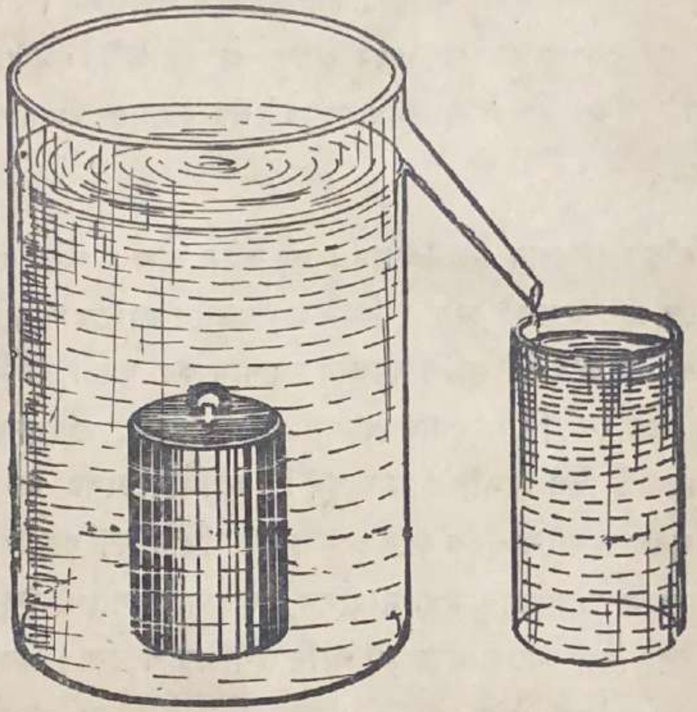

[কোন বস্তু পানিতে ডুবলে তার ওজন কিছুটা কমে যায়]

এরপর, আর্কিমিডিস আবার বসে পড়লেন অঙ্ক আর জ্যামিতি নিয়ে। দিন-রাত শুধু অঙ্কই কষলেন। কি যে আনন্দ তাঁর। অঙ্ক দেখলে ত' অনেকেই পালিয়ে বাঁচে, আর কিনা সেস্থলে তিনি অঙ্ককেই করেছেন গবেষণার মূল বিষয়বস্তু। গবেষণা চললো পুরাদমে, বিরামহীন গতিতে। কেউ জানলো না সে খবর ঃ আর্কিমিডিস ডুবে রইলেন নিজের জগতে।

কিছুদিন পর, একদা আর্কিমিডিস নিজে নিজেই রাজা হিয়েরো ও তাঁর পুত্র গেলোর সামনে গিয়ে হাজির হলেন। আবিষ্কারের গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠেছে। তিনি তাঁদের সামনে প্রকাশ করলেন, কেউ যদি পৃথিবীটার

বাইরে দাঁড়াবার মত এতটুকু জায়গা করে দিতে পারে তবে তিনি অতি অনায়াসেই এই পৃথিবীকে শক্তির সাহায্যে দূরে সরিয়ে ফেলতে পারবেন। এটা তাঁর গবেষণার ফলাফল।

সবাই শুনে ত' অবাক, একি আজব কথা! এতো শক্তি পেল কোথা থেকে? একি যাদুমন্ত্র না অন্য কিছু। রাজা হিরো ত' প্রথমতঃ বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তারপর বললেন, আচ্ছা, তাই যদি হয় তবে একটা কিছু পরীক্ষা করে দেখাও। আর্কিমিডিসও তাঁর আবিষ্কৃত অসুরের ন্যায় মহাশক্তি পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন। তাঁর কথামত একটা জাহাজে মাল বোঝাই করে তা' সমুদ্রের তীর থেকে কিছু দূরে দাঁড় করানো হলো। তিনি জাহাজটার সাথে একটা লম্বা রশির একমাথা বাঁধলেন, অপর মাথা বাঁধলেন তাঁর নব-নির্মিত যন্ত্রের সাথে। তারপর, রশির মাথা ধরে একাই টানতে শুরু করলেন। জাহাজটা হিড় হিড় করে ক্ষিপ্রগতিতে চলে এলো তীরে। রাজা অভিভূত হলেন আর্কিমিডিসের জ্ঞান ও শক্তির অসীমতা দেখে।. সত্যিই ত' তাই—অসুরের ন্যায় এতো শক্তি সে কি করে পেল। আসলে এ শক্তি তিনি পেয়েছিলেন তাঁর নব-নির্মিত কপিযন্ত্র থেকে।

তৎকালে ভূমধ্যসাগরের দুই উপকূল রোম ও কার্থেজ নামক দু'টি পরাক্রমশালী রাজ্য ছিল। এরা সুযোগ পেলেই আশে-পাশের ছোট ছোট রাজ্যগুলোর উপর আক্রমণ চালাতো, এগুলোকে গ্রাস করার চেষ্টা করতো। এমনি একদিন সুযোগ বুঝে সিরাকিউযকে ছোট্ট রাষ্ট্র পেয়ে রোমানরা সত্যি সত্যিই তা' আক্রমণ করে বসলো। রাজা হিরো এতে মোটেই ভীত হলেন না, সাথে সাথেই তিনি আর্কিমিডিসকে ডেকে পাঠালেন। এতো বড় বিজ্ঞানী থাকতে তাঁর ভয় কোথায়? আর্কিমিডিসও তখন অঙ্ক আর জ্যামিতি ছেড়ে দেশ সেবায় মন দিলেন—যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর কাজে উঠে পড়ে লাগলেন। ফলে, তিনি 'আতশী কাঁচ'কে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। এতে, একটা অর্ধ বৃত্তাকার কাঁচের সাহায্যে সূর্যের অনেকগুলো রশ্মিকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করা হয়, তারপর ওই একত্রিত

রশ্মিগুলো কোন যুদ্ধ জাহাজের পালে ফেলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাতে আগুন ধরানো যায়। সত্যিকথা বলতে কি, আর্কিমিডিস ‘আতশী কাঁচের’ সাহায্যে রোমানদের অনেকগুলো যুদ্ধ জাহাজ পুড়িয়েছিলেন।

আর্কিমিডিস যখন আলেকজান্দ্রিয়ায় লেখাপড়া করতেন, সেই সময় থেকেই তিনি মিসরের মরুভূমি অঞ্চলের কথা ভাবতেন। তিনি দেখতেন, চারিদিকে বিস্তর মাঠ পড়ে আছে, অথচ সেখানে খামার নেই, শস্য নেই, গাছ-গাছড়া জন্মে না। কি করে এইসব মরু অঞ্চলে পানি সেচ করে সুজলা-সুফলা শস্য ক্ষেত্রে পরিণত করা যায়, এই ছিল তাঁর চিন্তা। পরবর্তীকালে গবেষণার ফলস্বরূপ তিনি এর একটা যথাবিহিত উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি পেঁচওয়ালা ধাতব চোঙার সাহায্যে একটা যন্ত্র তৈরী করলেন। পানি ভর্তি পাত্রে এক মাথা ডুবিয়ে চোঙাটি ঘুরাতে থাকলে অপর মাথা দিয়ে সহজেই পানি বেরিয়ে আসে। ফলে, ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করা যায়। এটি বল-বিজ্ঞানে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে আজও সমাদৃত—আর্কিমিডিসের স্ক্রু নামে জগৎ খ্যাত।

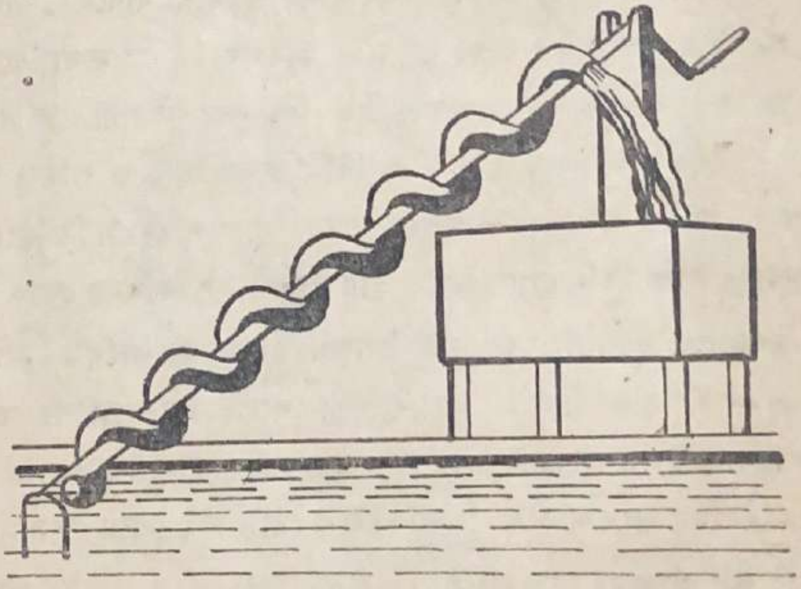

[পেঁচওয়ালা ধাতব চোঙের সাহায্যে একটা যন্ত্র তৈরী করলেন]

যীশু খ্রীস্টের জন্মেরও প্রায় আড়াই শ’ বছর আগেকার কথা। একবার চিন্তা করে দেখ; সে সময় বিজ্ঞান ছিল কতকগুলো প্রাথমিক ধারণার উপর

প্রতিষ্ঠিত, প্রমাণের কোন বালাই ছিল না। দেব-দেবীর অলীক শক্তির কাহিনী আর ঝাড়ফুঁকই ছিল তখনকার দিনের বিজ্ঞান। কিন্তু আর্কিমিডিসই সর্বপ্রথম সে পথ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ এক নতুন পথ অনুসরণ করলেন; বিপ্লবের সূচনা করলেন মানুষের চিন্তার গতানুগতিকতায়। তিনি বললেন, প্রমাণ ছাড়া বিজ্ঞান অচল। তিনি অঙ্ক আর জ্যামিতির সাহায্যে সবকিছু প্রমাণ করতে চাইতেন। তাই তিনি আজীবন কখনই তাঁর প্রিয় বিষয় দু'টিকে হাত ছাড়া করেননি। অবশ্য, আজকের তুলনায় সেদিনের অঙ্কের মান ছিল অনেক নীচু। তোমরা বর্তমানে উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে যে-সব অঙ্ক করে থাক, সেগুলোই ছিল আর্কিমিডিসের আমলের অঙ্ক।

আর্কিমিডিস ছিলেন বড় অদ্ভুত ধরনের লোক। প্রায় সময়ই তিনি আহার-নিদ্রার কথা ভুলে যেতেন। অবশ্য তাঁর সহচরগণ এ ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান ছিল। তারা প্রায়ই তাঁকে গোছল, আহার প্রভৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দিত। আবার কখনও কখনও এমনও দেখা গেছে যে তাঁর সহচরগণ হয়ত গোছলের জন্য তাঁর শরীরে তেল মর্দন করছে আর উনি ফাঁক বুঝে অমনি বালুর উপরই জ্যামিতির ছবি আঁকছেন। কি অদ্ভুত! বিজ্ঞানের এতো বড় সাধক ক'জন দেখা যায়?

আর্কিমিডিস তাঁর আবিষ্কারের ফলাফল ;নিয়ে অনেকগুলো বই লিখেছিলেন। এসব বইয়ের অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। কেননা, তিনি ছিলেন বড্ড খেয়ালী—আত্মভোলা লোক। অনেক খোঁজা-খুঁজির পরও আজ পর্যন্ত তাঁর হারিয়ে যাওয়া বইগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এসব বইয়ের অধিকাংশই ছিল জ্যামিতি আর গণিত নিয়ে লেখা। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের লেখা থেকে এ বিষয়ে জানতে পারা যায়।

আর্কিমিডিস ছিলেন বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক, মহাজ্ঞানী পণ্ডিত। তাঁর এ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আশে-পাশের প্রায় সকল দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এতো বড় মহাজ্ঞানী পণ্ডিতের মৃত্যু হয়েছিল এক মর্মান্তিক ঘটনার মধ্য দিয়ে। যে সময় তাঁর মাথার উপর মৃত্যুর

তরবারি ঝুলছিলো সে সময়ও তিনি জ্যামিতির ছবি আঁকছিলেন। তরবারির আঘাত যে কত বড় নির্দয় ও কঠিন হতে পারে, মৃত্যুর পূর্বে তা' নিয়ে চিন্তা করার মোটেই সময় ছিল না তাঁর।

সে সময় রাজা হিরো জীবিত ছিলেন না। রোমান সেনাপতি মোর্সেলাসের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী সিরাকিউয রাজ্যটি আক্রমণ করে বসলো। চারদিক থেকে শত্রু সৈন্যেরা ঘিরে ফেললো নগর রাষ্ট্রটি; জলপথ ও স্থলপথ কোন কিছুই বাদ রইলো না। সবাই দেখলো নিরূপায়! এতো বড় পরাক্রমশালী রোমান বাহিনীকে কি করে পরাজিত করা যাবে! সাথে সাথেই রাজ-দরবারে ডাক পড়লো বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিসের। একমাত্র তাঁর বুদ্ধি ও কৌশলেই হয়ত' এ রাজ্য রক্ষা পেতে পারে; নতুবা ধ্বংস সুনিশ্চিত। শীঘ্রই আর্কিমিডিস এক নতুন ধরনের চাবুক আবিষ্কার করলেন এবং প্রাচীরের উপর দিয়ে সেই চাবুকের সাহায্যে শত্রু সৈন্যকে কষাঘাত করার হুকুম দিলেন। সাথে সাথেই ফল ফললো শত্রু সৈন্যেরা মরি কি বাঁচি বলে ছুটে পালিয়ে দূরে সরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলো। জলপথেও তারা বেদম ঘায়েল হলো।

শত্রুপক্ষের সেনাপতি মোর্সেলাসও কিন্তু চট করে পরাজয় স্বীকার করার পাত্র নন। তিনি তখন অন্য পন্থা খুঁজলেন। মনে মনে ভাবলেন, সিরাকিউযবাসীদের সাথে অন্যান্য রাজ্যের যোগাযোগ ছিন্ন করতে পারলেই জয়লাভ সুনিশ্চিত। সাক্ষাৎ যুদ্ধে ঘায়েল হয়ে মোর্সেলাসের দল অপকৌশল অবলম্বন করলো। সিরাকিউযবাসীরা ভাবলো, এ অবরোধ হয়ত বেশী দিন টিকবে না। অল্পদিন পরেই তল্পিতল্পা নিয়ে রোমানরা বিদায় নিতে বাধ্য হবে। কিন্তু তা হলো না। দীর্ঘ তিন বছর ধরে তারা সিরাকিউয নগরীর পথ-ঘাট আগলিয়ে রাখলো। অধিক দিন অবরোধ থাকার ফলে কিছুসংখ্যক সিরাকিউযবাসী গোপনে মোর্সেলাসের দলে নাম লিখালো। ফলে, আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ নগরীটি রোমানদের অধিকারে আসতে লাগলো।

মোর্সেলাস আর্কিমিডিসের পাণ্ডিত্য আর বুদ্ধিমত্তার কথা অনেক আগে থেকেই জানতেন। তাই, তিনি এই মনীষীকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ

করলেন এবং আর্কিমিডিসকে সসম্মানে বন্দী করে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। একদিন জন কয়েক রোমান সৈন্য সোজাসাজি আর্কিমিডিসের পাঠাগারে গিয়ে হাজির হলো। আর্কিমিডিস তখনও আপন মনে জ্যামিতির ছবি আঁকছিলেন। কোন দিকে তাঁর খেয়াল ছিল না। ধৈর্যহারা মূর্খ সৈনিকদের হঠাৎ আগমনে তিনি বিরক্ত হলেন এবং সাথে সাথে তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু এই অবোধ সৈনিকের দল বুঝতেও পারলো না, কেন আর্কিমিডিস তাদের বেরিয়ে যেতে বলেছেন। বলা বাহুল্য তাদের হঠাৎ প্রবেশের ফলে তাঁর জ্যামিতির সমাধান বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু নির্বোধ সৈনিকের দল কোন মূল্য দিতে পারলো না মহাসাধকের এই জ্ঞান সাধনার। ক্রোধান্ধ সৈনিকের দল তরবারির আঘাতে হত্যা করলো আর্কিমিডিসকে—হত্যা করলো আধুনিক বিজ্ঞানের জনককে।

আর্কিমিডিসের মৃত্যুতে মোর্সেলাস দুঃখ পেলেন অনেক। এরূপ মর্মান্তিক ঘটনার জন্য তিনি কখনই প্রস্তুত ছিলেন না। শোকার্ত হৃদয়ে তিনি আর্কিমিডিসের কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনকি আর্কিমিডিসের ইচ্ছানুযায়ী তিনি তাঁর কবরে একটা নলাকার পাত্র ও একটা গোলক খোদাই করে দিয়েছিলেন।

সিরাকিউয নগরী এখন আর নেই। বহু পূর্বেই তা' ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কিন্তু, বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিসের নাম আজও পৃথিবীর বুকে অমর হয়ে আছে এবং তা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবে। অনন্তকালের জন্য পৃথিবীর মানুষ এই অমর বিজ্ঞানীর নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

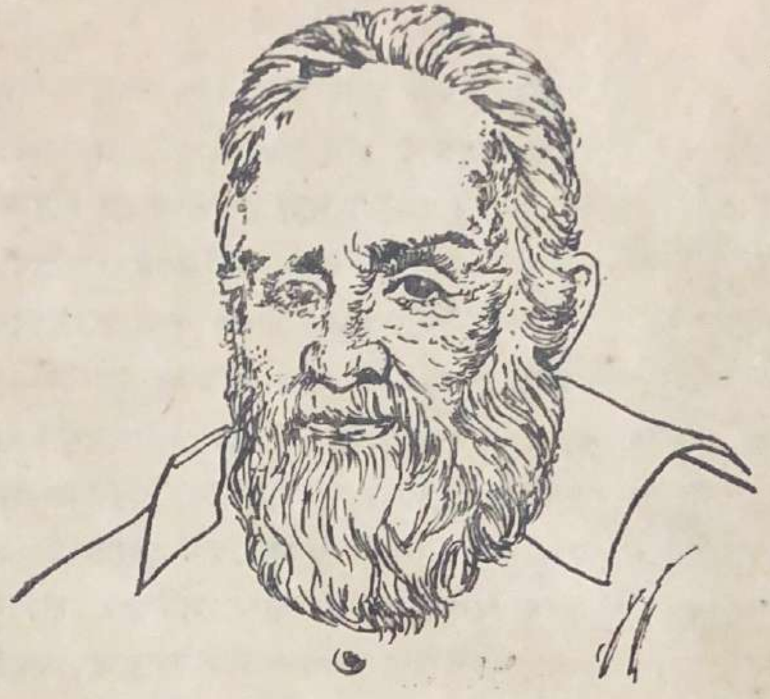

৬

গ্যালিলিও গ্যালিলী

বিচারকদের সভা বসেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। থম্‌থমে ভাব। কারও মুখে কোন কথা নেই। বিচার সভায় একজন বৃদ্ধলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বিচার হবে তাঁর। পরিণাম তিনি জানেন না। ভীরু তাঁর চাহনি—হাত-পা কাঁপছে। অল্প সময়ের মধ্যেই বিচারের রায় ঘোষণা করা হবে—হয় মৃত্যুদণ্ড নতুবা দীর্ঘমেয়াদী কারাভোগ! কত নিষ্ঠুর সে রায়!

বিচারকদের মধ্যে থেকে একজন উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বিচারের রায় ঘোষণা করে তিনি বললেন, আসামীকে কারাবরণ করতেই হবে। কেননা তিনি প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন; 'সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে'—এ কথা তিনি অস্বীকার করেছেন। কত বড় স্পর্ধা তাঁর! তিনি কিনা বলেছেন, ওটা ভুল, কিছুতেই তা' হতে পারে না—পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে।

এ নিষ্ঠুর রায় শোনার সাথে সাথেই একে অপরের মুখের প্রতি তাকালো। মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠলো চারিদিকে। আস্তে আস্তে গোটা

পরিবেশে অসহ্য হয়ে দাঁড়ালো। সত্তর বছরের বৃদ্ধ আসামী আর কিছুতেই টিক্‌তে পারলেন না। ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। চোখ দিয়ে ঝরঝরে পানি ঝরলো। সভাসদগণ বিদায় নিলেন। তারপর, বৃদ্ধ আসামীকে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। যেতে যেতে মৃদু কণ্ঠে তিনি বার বার উচ্চারণ করলেন, 'না তা' সঠিক নয়। পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে—এটাই সত্য। একদিন না একদিন একথা তাদের মেনে নিতেই হবে।'

এই বৃদ্ধ আসামীটি কে জানো? ইনিই জগৎ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও গ্যালিলী। বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কারকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। গ্যালিলিও যে-যুগের বৈজ্ঞানিক সে-যুগে কিন্তু বিজ্ঞানচর্চা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। সে সময় কতকগুলো ভ্রান্ত মতবাদ আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল গোটা পৃথিবী। তখনকার দিনে কোন সত্য ঘটনা প্রমাণ করে দেখালেও সহজে কেউ তা' বিশ্বাস করতে চাইতো না। প্রায় সময়ই প্রমাণকারীকে কাফের ও যাদুকর প্রভৃতি অপবাদ দেওয়া হতো কিংবা তাকে অন্যায়কারী হিসেবে সাজা ভোগ করতে হতো।

১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ইটালীর পিসা শহরে গ্যালিলিওর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক। কিন্তু তাঁদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। গ্যালিলিওর পিতা ভাল গাণিতিক ও নামকরা সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রোজগার ছিল কম। কষ্টে-স্থষ্টে কোন রকমে দিন চলতো। তিনি ভাবতেন গ্যালিলিও বড় হয়ে রোজগার করলেই তাঁদের এ দুঃখ-কষ্টের লাঘব হবে। তাই তিনি ছেলের লেখাপড়ার জন্য তখন থেকেই পয়সা জমাতেন।

সে-সময়ে ডাক্তারদের রোজগার ছিল অনেক বেশী। গ্যালিলিওর মাতা-পিতাও আশা করেছিলেন, ছেলেকে ডাক্তারী পড়াবেন। কিন্তু, গ্যালিলিওর তাতে মোটেও আগ্রহ ছিল না। ছোটবেলা থেকেই যন্ত্র তৈরী আর অঙ্ক শেখার প্রতি ছিল তাঁর বেজায় অনুরাগ। খেলার সামগ্রী হিসেবে প্রায়ই তিনি নানান ধরনের নতুন নতুন যন্ত্র তৈরী করতেন। আর, এতে তিনি

আনন্দও পেতেন অনেক বেশী। তথাপি, পিতা-মাতার কষ্টে সঞ্চিত অর্থের কথা চিন্তা করে তিনি তাঁদের ইচ্ছা পূরণের জন্য পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী বিভাগে ভর্তি হন। কিন্তু শেষ অবধি ডাক্তারী পড়া কিছুতেই তাঁর ভাল লাগলো না। শীঘ্রই তিনি অঙ্ক আর দর্শন নিয়ে মেতে উঠলেন।

তখনও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বয়স মাত্র উনিশ বছর। এই সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত দোলকের সূত্রটি আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ঘটনাটি কিন্তু বড়ই চমক্‌প্রদ। একদিন তিনি জানু পেতে প্রধান গির্জায় উপাসনা করছিলেন। এমন সময় ছাদে ঝুলানো বাতিটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। তিনি দেখলেন, বাতাসের বেগে এটি দুলছে। বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে তা' নিরীক্ষণ করলেন। তারপর, এক সময় নিজের হাতের কব্জি টিপে ধরে নাড়ির স্পন্দন গুণলেন এবং এই গণনার সাথেই তিনি লক্ষ্য করলেন যে ঝুলানো বাতির প্রত্যেকটি দোলে একই সমান সময় লাগছে। ছোট বা বড় দোলনে এই সময়ের কোন পার্থক্য হয় না, শুধুমাত্র বাতাসের গতিবেগ বাড়ে বা কমে বলেই দোল খাওয়ার দূরত্বও সেই অনুপাতে বাড়ে বা কমে। বলাবাহুল্য এটিই তাঁর বিখ্যাত দোলকের সূত্র। এই সূত্র থেকেই পেণ্ডুলাম বা দোলক-ঘড়ির সৃষ্টি হয়েছে।

এরপর গ্যালিলিও কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের জন্য একটা নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। এটির নাম হাইড্র‌স্টেটিক ব্যালান্স। তাঁর এ নতুন যন্ত্রটি আবিষ্কারের ফলে চারদিকে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল। শীঘ্রই গ্যালিলিও বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। তাঁকে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত করা হলো।

মিথ্যাকে গ্যালিলিও মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত যে-কোন চিরাচরিত প্রথার প্রতি ছোট বেলা থেকেই তাঁর মোটেও আস্থা ছিল না। কখনো একটু খট্‌কা লাগলে তখনি তিনি সে সম্বন্ধে বিশারদদের কাছে নানান্ ধরনের প্রশ্ন করতেন। কেউ তা' ঠিক মত বুঝিয়ে দিতে না পারলে কিছুতেই তিনি তা' মানতেন না। কিন্তু তখনকার দুনিয়ার ভাবধারা

ছিল অন্য রকম ; আগে থেকে যে অন্ধ বিশ্বাস চলে আসছে তা' তোমাকে মানতেই হবে। নতুবা সবার কাছে তুমি দোষী সাব্যস্ত হবে। এরূপ যাদের চিন্তাধারা, তারা কি কখনও গ্যালিলিওকে সহ্য করতে পারে ? তাই, শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র কেউ তাঁকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখতো না। এমন কি তারা তাঁকে "ঝগড়াটে" পদবী দিতেও কসুর করেনি।

গ্যালিলিও কিন্তু এসব অপবাদ নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাতেন না। তিনি বলতেন, 'যা' মিথ্যে যার কোন ভিত্তি নেই—তা' কোনক্রমেই মেনে নেওয়া যায় না। প্রত্যেক জিনিসই প্রমাণ সাপেক্ষ।' কাজে কাজেই তাঁর দুশমনদের সংখ্যাও ছিল অনেক।

বহুকাল থেকে অ্যারিস্টটল কর্তৃক প্রচারিত দর্শন আর বিজ্ঞানের মতবাদগুলো অভ্রান্ত বলে স্বীকৃত হয়ে আসছিল। অ্যারিস্টটল ছিলেন গ্রীস দেশের একজন অসামান্য প্রতিভাধর দার্শনিক। তোমরা অনেকেই হয়ত গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের নামের সাথে পরিচিত। অ্যারিস্টটল ছিলেন এই গ্রীক বীরের শিক্ষক। তাঁর প্রচারিত মতবাদগুলোর একটিতে তিনি বলেছিলেন, 'দুটো ভারী জিনিস উঁচু স্থান থেকে নিক্ষেপ করলে বেশী ওজনের দ্রব্যটি তাড়াতাড়ি মাটিতে পড়বে। শুধু তাই নয় ; ভারী দ্রব্যটি ছোটটি অপেক্ষা ওজনে যে অনুপাতে বেশী, ঠিক সেই অনুপাতে দ্রুত সেটা মাটিতে পড়বে।' এ মতবাদ কিন্তু গ্যালিলিওর কাছে সম্পূর্ণ খাপছাড়া বলে মনে হলো। অন্ধ বিশ্বাসের বশে তিনি তা' মানতে রাজী হলেন না। একদিন এ নিয়ে বাস্তব পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন।

সেদিন ভোর বেলা। শত্রু-মিত্র সবাইকে তাঁর এ পরীক্ষায় শরীক হওয়ার জন্য দাওয়াত করলেন। ছাত্র-শিক্ষকসহ অন্যান্য দর্শকদের অনেকেই হাজির হলেন। কেউ-বা এ পরীক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—কেউ-বা শুধুমাত্র ফলাফল জানার জন্য অপেক্ষা করলেন। তারপর, এক সময় গ্যালিলিও সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে কতকগুলো অসমান ওজনের ভারী লোহার বল নিয়ে পিসা নগরীর বিখ্যাত হেলানো স্তম্ভের উপরে উঠলেন, নীচে অপেক্ষমান জনতার প্রতি দৃষ্টি

নিক্ষেপ করে একটা প্রশান্তির হাসি হাসলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ! এক সময় তিনি দু'টো অসমান ওজনের বল নিয়ে একই সাথে নীচে ফেললেন। বল পড়ার শব্দ হলো—সবারই কর্ণকুহরে সে-শব্দ প্রবেশ করলো। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করলেন, দুটো শব্দ একই সাথে শোনা গেছে। গ্যালিলিও আরও বার কয়েক এই পরীক্ষা চালালেন। প্রত্যেকবারই একই ফল ফললো। সামান্য একটি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এতোদিনের পুরাতন ভ্রান্ত মতবাদটি পাল্‌টে গেল। কিন্তু, এই মহান আবিষ্কারটির ফলেই গ্যালিলিওর জীবনে নেমে এলো দুর্যোগ। শত্রুরা এতে মোটেই সন্তুষ্ট হলো না—প্রত্যক্ষভাবে নাজেহাল হওয়ায় মনে মনে তারা আরও রেগে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে লাগলো।

এরপর, এক বৎসর যেতে না যেতেই একটা ঘটনা ঘটলো। এ ঘটনাই এনেছিল গ্যালিলিওর জীবনে এক দারুণ বিপত্তি। তথাপি তিনি সত্য প্রতিষ্ঠায় পিছ-পা হননি।

এই সময় পিসা নগরীর একজন বেশ প্রতিপত্তিশালী লোক পানি থেকে কাদা সরানোর একটা যন্ত্রের নক্‌শা তৈরী করলেন। গ্যালিলিও এই প্রস্তাবিত নক্‌শাটি দেখে ভালভাবে তা' পরীক্ষা করলেন। তারপর তিনি বললেন, এই যন্ত্র দিয়ে কাদা সরানোর কাজ মোটেই কার্যকরী হবে না। তাঁর কথা শোনা মাত্রই ওই লোকটি তাঁকে বিদ্রূপ করলেন এবং গ্যালিলিওর কথা উপেক্ষা করেই অনেকগুলো যন্ত্র তৈরী করলেন। কিন্তু মাটি সরাতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন, সত্যি সত্যিই যন্ত্রগুলো কার্যকরী হচ্ছে না। তখন গ্যালিলিওর উপর তাঁর রোষ পড়লো। গ্যালিলিও হলেন ওই ব্যক্তির দু'চোখের বিষ! লোকটি অপরের সাহায্যে গ্যালিলিওকে অপমান করলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো। বাধ্য হয়েই পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীরে ইস্তফা দিতে হলো তাঁকে। তারপর, অস্থায়ীভাবে তিনি ফ্লোরেন্স শহরে বসবাস করতে লাগলেন।

কিন্তু এখানেও দুঃখ-কষ্ট গ্যালিলিওর পিছু ছাড়লো না। এই সময় তাঁর

পিতৃবিয়োগ ঘটে। ফলে, বিরাট সংসারের গুরু দায়িত্ব এসে পড়লো তাঁর কাঁধে। তিনি মাথা পেতে এ দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেন। কেননা, দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি তাঁর কাছে কখনই নতুন নয়; জন্মের পর থেকে সব সময়ই তিনি এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন।

১৫৯২ খ্রীস্টাব্দে পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক পদের আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি তা' গ্রহণ করলেন। এখানে অধ্যাপনা কালেই গোটা ইউরোপে তাঁর বৈজ্ঞানিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই তাঁর ক্লাসগুলোতে বক্তৃতা শোনার জন্য অসংখ্য ছাত্রের ভিড় জমতে লাগলো। গ্যালিলিওর ন্যায় বড় বৈজ্ঞানিকের দর্শন লাভের অভিপ্রায়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্ররা এসে ভিড় জমাতো।

১৬০৪ খ্রীস্টাব্দে গ্যালিলিও তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে জ্যোতি-র্বিজ্ঞানকে বেছে নেন। এই সময় আসমানে একটা নতুন তারকা দেখা দেয়। এটা নিয়ে অন্যান্য জ্যোতির্বিদরা পড়লেন মহা গোলমালে। তাঁদের কেউ কেউ বললেন, ওটা একটা উল্কাপিণ্ড, আর কেউ কেউ একদম হকচকিয়ে গিয়ে কোন কথাই বলতে সক্ষম হলেন না। এদিকে গ্যালিলিও নিবিষ্ট মনে দিনের পর দিন ধরে ওটা পর্যবেক্ষণ করলেন; তারপর বললেন, ওটা একটা স্থির তারকা ভিন্ন আর কিছুই নয়। অন্যান্য জ্ঞাত গ্রহ-উপগ্রহের চেয়ে ওটা অনেক দূরে অবস্থিত। অল্প দিনের মধ্যেই ওই তারকাটি অদৃশ্য হয়ে যাবে।

এরপর গ্যালিলিও বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করলেন। এতে স্থান পেল প্রধানতঃ শব্দ, যন্ত্র, গতি, সৌরমণ্ডলের গঠন, আলো এবং রং প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতবাদ। অনেকেই এ-কথা বিশ্বাস করেন যে এইসব গবেষণার সাহায্যেই গ্যালিলিও বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করতেন। এজন্য তাঁর পরবর্তী আবিষ্কারগুলোর কোন প্রয়োজন ছিল না। তাই এর পরের আবিষ্কারগুলো বিশ্বের সবার কাছে নতুন বিস্ময়ের সৃষ্টি করে গ্যালিলিওকে আর একবার অমরত্ব দান করেছে।

১৬০৯ খ্রীস্টাব্দের কথা। এই সময় একদিন গ্যালিলিও শুনতে পেলেন,

ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক জন লিংপারশী এক প্রকার দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করেছেন এবং সমতলভূমিতে দূরের জিনিস নিরীক্ষণ করার কাজে তা' ব্যবহার করছেন। গ্যালিলিও এতে উৎসাহ পেলেন প্রচুর। তখন আর তাঁকে পায় কে? তিনি কায়মনে যন্ত্র তৈরীর কাজে লাগলেন; তারপর, একটা—দু'টো—তিনটা এমনি করে অনেক যন্ত্র তৈরী করলেন। একদিন সত্যি সত্যি একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করে ফেললেন। আরও উন্নততর করলেন তা। সেই দূরবীণ দিয়ে মহাকাশের দিকে তাকালেন। কি আশ্চর্য! মহাশূন্যের সব রহস্যই একে একে তাঁর কাছে ধরা দিতে লাগলো।

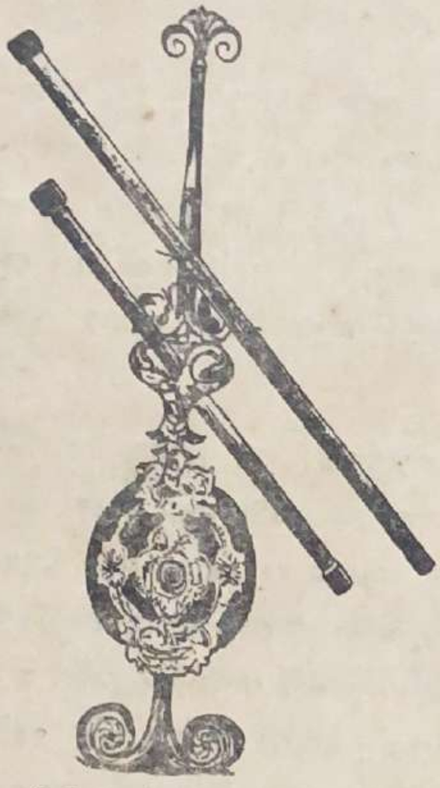
[গ্যালিলিওর তৈরী ও ব্যবহৃত দূরবীন]

গ্যালিলিও কিন্তু শুধুমাত্র যন্ত্র তৈরী করেই ক্ষান্ত রইলেন না। সাথে সাথেই তা' প্রদর্শনের জন্য ভেনিসে নিয়ে এলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা ব্যক্তিদের তা' দেখালেন। তাঁরা ত' নতুন ধরনের যন্ত্র দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন! সবাই খুশী হয়ে গ্যালিলিওকে পাডুয়ার আজীবন অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করলেন। শুধু তাই নয়—তাঁরা তাঁর মাসিক বেতন পাঁচ শ' বিশ থেকে বাড়িয়ে এক হাজার ফ্লোরিণে ধার্য করেন।

গ্যালিলিও আহার-নিদ্রা ভুলে এই যন্ত্র দিয়ে দিবারাত্র মহাকাশে পর্যবেক্ষণ চালালেন। ফলে চন্দ্র সূর্যের বহু 'অজানিত রহস্য ধরা পড়লো। মানুষের অজ্ঞতাজনিত পূর্বের ধারণা পাল্টে গেল। তিনি বললেন, চন্দ্রের পৃষ্ঠে অনেকগুলো পাহাড় পর্বত রয়েছে এবং 'এর আকৃতি পৃথিবীরই অনুরূপ। তা'ছাড়া, চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই; সূর্যের প্রতিফলিত

আলোকে চন্দ্র আলোকিত হয়। তিনি আরও বললেন, সূর্য কখনও স্থির ভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় বিরাজ করে না। এটি তার নিজ কক্ষপথে ঘুরে থাকে। এছাড়া, তখন পর্যন্ত 'ছায়াপথ' সবার কাছে রহস্যাবৃত ছিল। কেউই জানতো না যে ওটা কি। গ্যালিলিওই সর্বপ্রথম এ রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করলেন, —এটা বহু দূরে অবস্থিত কতকগুলো তারকার সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

অবিরামভাবে গ্যালিলিওর মহাকাশ পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রইলো। তিনি গ্রহ-উপগ্রহ সম্বন্ধে বহু নতুন নতুন তথ্য জানতে পারলেন। তিনি বললেন, পৃথিবী একটি গ্রহ—চন্দ্রই এর একমাত্র উপগ্রহ ; আর বৃহস্পতি গ্রহে চন্দ্রের ন্যায় চারটি উপগ্রহ রয়েছে। এই উপগ্রহগুলো নিজ নিজ কক্ষপথে গ্রহের চারিদিকে আবর্তন করে। আরও নিখুঁত অনুসন্ধানের পর তিনি বুধ ও শুক্র গ্রহের কক্ষপথ আবিষ্কার করলেন। সব কিছু পরীক্ষা করে তিনি মনে মনে ভাবলেন, তা'হলে কি কপারনিকাশের মতবাদ সত্য ?

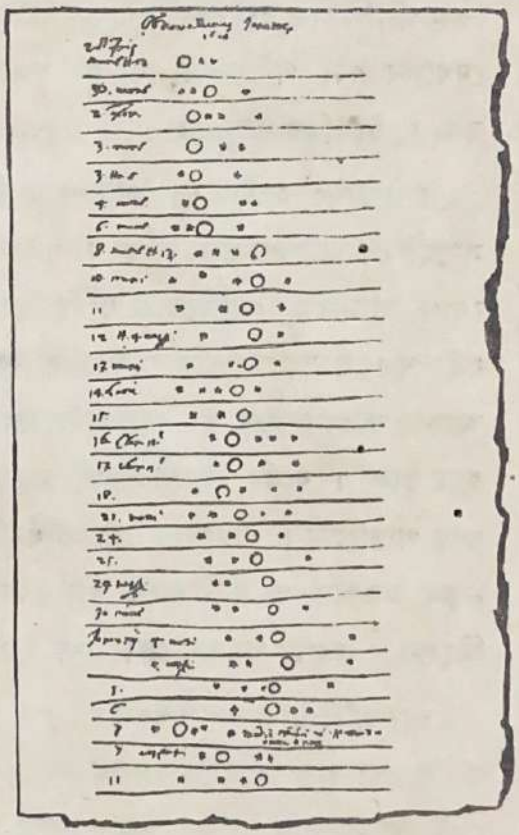

[গ্যালিলিওর মহাকাল পর্যবেক্ষণ-এর নিজ হাতে আঁকা একটি ছবি]

নিকোলাস কোপারনিকান ছিলেন একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। গ্যালিলিওর জন্মের প্রায় একশ' বছর পূর্বে পোলাণ্ডের টরুন শহরে তাঁর জন্ম। তিনিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন, সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ, উপগ্রহসমূহ নিয়ে সৌরজগৎ গঠিত। পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ নিজ নিজ

কক্ষপথে অনবরত সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু তিনি তাঁর এ নতুন মতবাদের স্বপক্ষে সবল কোন যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেননি। তাই, হিপারনিকাস নামক অপর একজন বৈজ্ঞানিক তাঁর এ মতবাদ অস্বীকার করলেন। কোন প্রমাণ ব্যতিরেকেই তিনি বললেন, 'সূর্যই পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তন করে। টলেমি স্বয়ং এ কথা প্রচার করেছেন—প্রচলিত ধর্মমতও তাই। সুতরাং, সবাইকে তা' মেনে নিতে হবে।' আশ্চর্যের বিষয়, বিনা বাক্য ব্যয়ে তখনকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ তা' মেনে নিয়েছিল। কিন্তু গ্যালিলিও বারবার তাঁর মহাকাশ পর্যবেক্ষণের ফলাফল পরীক্ষা করে দেখলেন এবং পরিশেষে ঘোষণা করলেন যে, কোপারনিকাসের মতবাদই সত্য। টলেমির তথ্য ভুল।

সৌরজগৎ সম্বন্ধে গ্যালিলিওর আবিষ্কৃত ফলাফল ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথেই প্রতিবাদের ঝড় উঠলো! তুমুল সে ঝড়! কুসংস্কারবাদীরা অভিযোগ আনলো, গ্যালিলিও ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের কথাকে তিনি অস্বীকার করেছেন। ক্রমেই এ প্রতিবাদ চরম আকার ধারণ করলো। শেষ পর্যন্ত তাঁকে রোম নগরীর গির্জায় হাজির হতে হলো। ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলার অপরাধে পোপ পল্ তাঁকে সমন করে পাঠালেন। তারপর, তাঁকে ধম্‌কিয়ে দেওয়া হলো—তিনি যেন এ নতুন মতবাদ আর কখনও প্রচার না করেন। গ্যালিলিও তা' মেনে নিলেন। এরপর পুনরায় ফ্লোরেন্সে ফিরলেন তিনি।

গ্যালিলিওর এরূপ ব্যবহারে সবাই বিস্মিত হলো। এতো সহজেই তিনি কর্তৃপক্ষের রায় মেনে নিবেন তা' অনেকেই বিশ্বাস করতে পারলো না। কেউ কেউ বললো—নিশ্চয় এর পিছনে কোন মতলব রয়েছে। তিনি কিন্তু এসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামালেন না। তিনি ডুবে রইলেন পড়াশোনা আর গবেষণা নিয়ে। এমনিভাবে সুদীর্ঘ সাত বছর অতিবাহিত হলো। এরপর, তিনি ধূমকেতুর উপর একটা সুন্দর গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। শত্রু-মিত্র সব মহলেই এটি সমাদৃত হলো। সারা দুনিয়া থেকে তাঁর জন্য অভিনন্দন এলো।

এই প্রবন্ধের সাফল্যে গ্যালিলিও আনন্দিত হলেন অনেক বেশী। তারপর, তিনি একখানা বই প্রকাশ করলেন। এতে কথোপকথনের মাধ্যমে পুনরায় তিনি তাঁর সৌরজগৎ সম্বন্ধে পূর্ব পরীক্ষার ফলাফল সুন্দরভাবে ব্যক্ত করলেন। কিন্তু এবার তিনি শত্রুর হাত রেহাই পেলেন না। সাথে সাথেই ডাক পড়লো রোমে। প্রচলিত রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধ মত প্রচারের জন্য বিচার বসলো। বিচারে দণ্ড হলো তাঁর। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল প্রকাশের অপরাধে তাঁকে আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

প্রকৃত পক্ষে গ্যালিলিওকে মাত্র কয়েক সপ্তাহ কারাবাস করতে হয়েছিল। এই সময় কারাগারে তাঁর প্রতিটি সুখ-সুবিধার প্রতি সুবন্দোবস্ত করা হয়েছিল। অল্পদিন পরেই কারামুক্তির পর সত্তর বছরের বৃদ্ধ এই মহান বৈজ্ঞানিক তাঁর পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হওয়ার অনুমতি পান।

কিন্তু দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে গ্যালিলিও আজীবন রেহাই পাননি। কারামুক্তির অল্পদিন পরেই তাঁর সবচেয়ে আদরের কন্যাটির মৃত্যু হয়। এর মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত বেশী দুঃখ পেলেন। কেননা, তিনি যখন দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করে তা' দিয়ে দিবারাত্র মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করতেন তখন তাঁকে এই আদরের কন্যাটিই সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল। এ ঘটনার পর তিনি প্রথমতঃ অনেকটা মুষড়ে পড়লেন। তারপর, আবার বিজ্ঞানের সাধনায় নিয়োজিত হলেন। গবেষণা কার্য চলতে থাকলো।

ক্রমেই তাঁর জীবন সায়াহ্ন ঘনিয়ে এলো। আর এই শেষ বয়সেই পেলেন তিনি চরমতম আঘাত। তিয়াত্তর বছর বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললেন ও তাঁর বাকশক্তি রুদ্ধ হলো! কত নিষ্ঠুর এ আঘাত! কিন্তু এতো কষ্টের মধ্যেও গ্যালিলিও হার মানলেন না। তিনি তখন বন্ধু-বান্ধবদের সহায়তায় বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখতে শুরু করলেন। সাধনার মধ্য দিয়ে কেটে গেল আরও পাঁচটি বছর। ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তারিখে তিনি মৃদু জ্বরে আক্রান্ত হন। আর তাতেই বিশ্ব রহস্যের

দ্বার উন্মোচনকারী অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকের ওই দিনই মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল আটাত্তর বছর।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে গ্যালিলিও অমর হয়ে থাকবেন। শত শত বাধা-বিপত্তি আর শত্রুতা সত্ত্বেও তিনি নিবিষ্ট মনে বিজ্ঞানের সাধনা করে গেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা তিনি। কেননা, তিনিই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন যে, পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ ছাড়া কোন মতবাদই টেক্সই নয়। আজীবন তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর ইটালিতে তাঁর পরীক্ষা ও আবিষ্কারের বিষয়বস্তুর সংকলন প্রকাশ করা হয়। এ বই সর্ব মোট একুশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল।

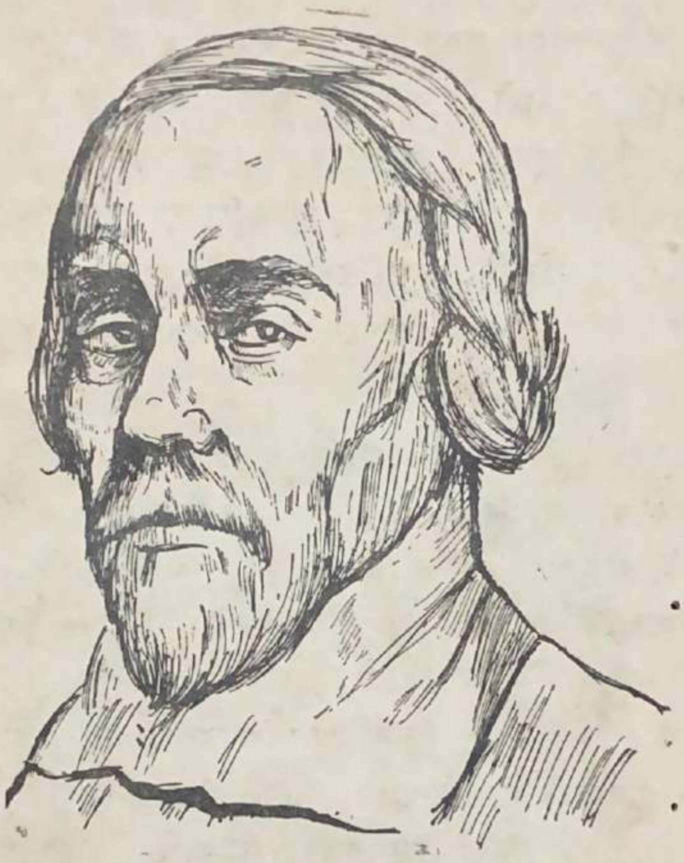

উইলিয়াম হার্ভে

১৬২৮ সাল। এই সময় ইংল্যাণ্ডে অন্যান্য শত শত বইয়ের সাথে লাটিন ভাষায় ছোট্ট একখানি বই প্রকাশিত হলো। মাত্র বাহাত্তর পৃষ্ঠার এ বই। অথচ এই বইয়ের মাধ্যমেই ঘোষিত হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক আমূল পরিবর্তনের কথা। মানবদেহে রক্ত চলাচল সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ ব্যক্ত করা হলো এতে। সে সময় অনেকেই বইখানা কিনে পড়েছিলেন; কিন্তু এর বিষয়বস্তু প্রায় কেউই বিশ্বাস করতে চাননি। কেননা, এতে তাদের প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতের বিরোধী সম্পূর্ণ এক নতুন কথা লেখা ছিল। আজকের দিনে অবশ্য সে বইখানা আর কেউ কিনে পড়েন না; অথচ এর বিষয়বস্তু সবাই বিশ্বাস করেন।

এই বইয়ের লেখকের নাম উইলিয়াম হার্ভে। ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে ইংল্যাণ্ডের ফকস্টোনে তাঁর জন্ম। হার্ভের পিতা ছিলেন একজন নামকরা ব্যবসায়ী। সামাজিক কাজ-কর্মেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনি তাঁর পুত্রকে শিক্ষাদানের জন্য প্রথমত: কিংস স্কুল ও পরে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। ছাত্র হিসেবে লেখাপড়ায় হার্ভে বেশ ভাল ছিলেন। তথাপি, একথা সেদিন কেউই ধারণা করতে পারেনি যে এই ছাত্রই একদিন চিকিৎসা বিজ্ঞানে সত্যের সন্ধান দিয়ে অমরত্ব লাভ করবে।

উইলিয়াম হার্ভে ছিলেন বেঁটে প্রকৃতির লোক। সব সময় উৎসাহ আর উদ্দীপনায় ভরা থাকতো তাঁর মন। কিন্তু মেজাজ ছিল বড্ড খিট্‌খিটে ধরনের। চট্‌ করে রেগে যেতেন তিনি। কোন একটি নির্জন স্থানে বসে বসে চিন্তা করতে তিনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। তাঁর এ চিন্তাস্রোতে কখনও বাধা পড়লে ভীষণভাবে রেগে যেতেন; এমনকি, মাঝে মাঝে মারতেও উদ্যত হতেন। তাই তিনি এসব ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অন্ধকারে বসে থাকতেন। এতে তাঁর সাধনা বিঘ্নিত হতো না। তা ছাড়া, তিনি বাড়ীর মধ্যে কতকগুলো পরিখা খনন করেছিলেন এবং প্রায় সময়ই এসবের মধ্যে ধ্যানরত অবস্থায় থাকতেন।

পড়াশুনা ছিল উইলিয়াম হার্ভের নিত্য সাথী। জ্ঞানপিপাসা নিবারণের জন্য আজীবন তিনি কখনও বই ছাড়া থাকেননি। হার্ভের নিজের লেখা বইয়ের মধ্যে তাঁর এ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ডজন খানেক বই লিখেছিলেন। অবশ্য এর বেশীর ভাগ বই-ই ইংল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় দুর্বৃত্তদের হাতে পড়ে নষ্ট হয়েছিল। এদের মধ্যে দুটো বই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য—একটির বিষয়বস্তু ছিল 'হৃদপিণ্ড কেমন করে কাজ করে' এবং অপরটি 'প্রজনন' সম্বন্ধে লিখিত। এ বইগুলো প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল।

১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়াম হার্ভে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা বিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর অনুরূপ অপর একটি ডিগ্রি লাভের বাসনায় পাড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পাড়ুয়া ছিল তখনকার দিনে ডাক্তারী শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্রস্থল। তথাপি এখানে ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা আর শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে সে সময় যেসব শিক্ষাদান করা হতো তা' ছিল মূলতঃ অনেক পুরাতন—প্রথম খ্রীস্টাব্দে এসব ধারণা প্রবর্তিত হয়েছিল। গ্যালেন নামক একজন গ্রীক চিকিৎসাবিদ এসব তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। তাঁর মতে, এক প্রকার শ্বেতবর্ণ পদার্থ অন্ত্র থেকে যকৃতে প্রবেশ করে এবং এখানেই সেগুলো শিরাশ্রিত রক্তে পরিণত হয়ে সাথে সাথেই প্রাকৃতিক শক্তি প্রাপ্ত হয়, পরে তা' যকৃতের সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

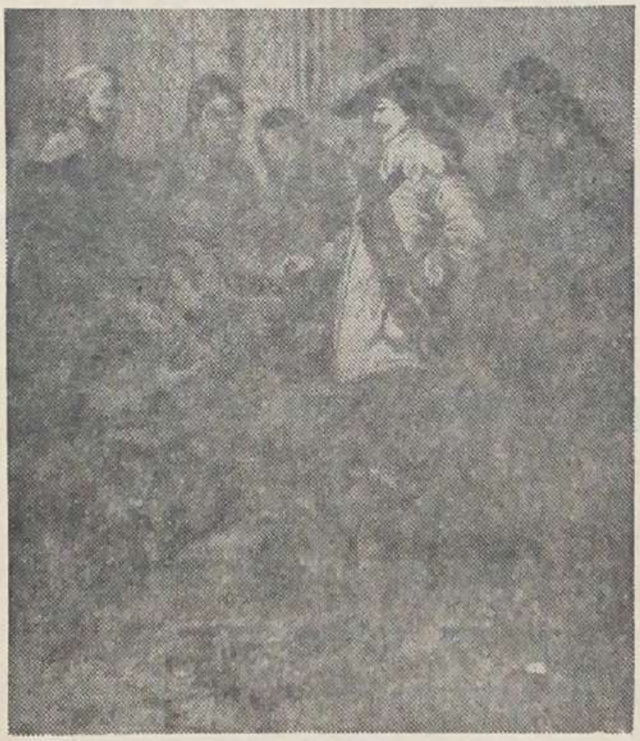

[একটি জীবিত প্রাণীর দেহ কেটে হৃৎপিণ্ড কেমন করে কাজ করে দেখাচ্ছেন।]

বৈজ্ঞানিক গ্যালেন মানুষের হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে আরও একটি মতবাদ প্রচার করেছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে তাঁর এই মতবাদ কারও মনে সামান্যতম সন্দেহের উদ্রেক করেনি। তিনি একদিন কোন একটি প্রাণীর ধমনী কেটে ফেলেন এবং লক্ষ্য করেন যে, ওই প্রাণীর শিরা ও ধমনী উভয়ের মধ্য থেকেই রক্ত বেরিয়ে আসছে। ফলে তিনি শিরা ও ধমনীর মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে পেলেন। তারপর বললেন, মানুষের হৃৎপিণ্ডের ডান ও বাম পার্শ্বের মাঝামাঝি স্থানে একটা দেওয়াল রয়েছে। এদের উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য দেওয়ালটির গায়ে কতকগুলো ছোট ছোট ছিদ্র রয়েছে। এই-সব ছিদ্রের মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ডের উভয় পার্শ্বে রক্ত চলাচল করে থাকে।

দীর্ঘকাল পরে উইলিয়াম হার্ভের সমসাময়িক কালে গ্যালেনের প্রচারিত মতবাদের কিছু কিছু পরিবর্তন হতে থাকে। ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এন্‌ড্রিস ভেসালিয়াস হৃৎপিণ্ডের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত দেওয়ালের গাত্রে ছিদ্রের কথা অস্বীকার করেন। তিনি বললেন, এ মতবাদ ভুল। ভেসালিয়াস ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত ব্যবচ্ছেদবিদ।

ভেসালিয়াসের পর রিলডো কলোম্ব নামক অপর একজন বৈজ্ঞানিক হৃৎপিণ্ডের উভয় পার্শ্বে রক্ত চলাচলের প্রকৃতি সম্বন্ধে গ্যালেনের মতবাদটি পরিবর্তিত করেন। তাঁর মতে, হৃৎপিণ্ডের উভয় পার্শ্বে সোজাসুজি ভাবে রক্ত চলাচল করে না ; ডান পার্শ্ব থেকে রক্ত প্রথমতঃ মহাধমনীর মধ্য দিয়ে যকৃতে প্রবেশ করে এবং পরবর্তীকালে তা' মহাশিরার মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ডের বাম পার্শ্বে প্রবেশ করে।

গ্যালেনের মতবাদের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেন উইলিয়াম হার্ভের শিক্ষক বৈজ্ঞানিক ফেব্রিসিয়াস। ইনি পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন এবং মানুষের হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে গবেষণা চালান। একদিন তিনি তাঁর গবেষণার ফলাফল ঘোষণা করে বললেন, ডান ও বাম পার্শ্বের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত-প্রবাহী শিরাসমূহে কতকগুলো কপাটিকা

রয়েছে। এগুলোকে তিনি "ক্ষুদ্র দরজা" নামে অভিহিত করলেন। তিনি বললেন, রক্ত চলাচলের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এসব কপাটিকা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর অধিক কিছু বলতে তিনি সক্ষম হননি। কিন্তু তাঁর এই তথ্যই উইলিয়াম হার্ভের মনে হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে গবেষণার বীজ বপন করেছিল। তখন থেকেই হার্ভে এ'বিষয়ে অল্প-বিস্তর চিন্তা ভাবনা করতেন।

১৬০২ খ্রীস্টাব্দে তিনি পাডুয়া থেকে ডাক্তারী ডিগ্রী লাভের পর ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন এবং লণ্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে মনস্থির করেন। এই সময় ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথের গৃহ চিকিৎসক লেনসেলট ব্রাউনের পরিবারের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। তিনি লেনসেলটের কন্যা এলিজাবেথ ব্রাউনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। উইলিয়াম হার্ভের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে এর অধিক কিছু জানা যায় না।

১৬০৯ খ্রীস্টাব্দে হার্ভে সেণ্ট বার্থলোমিউ হাসপাতালের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন তিনি হাসপাতাল পরিদর্শনে যেতেন। হাসপাতালে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথেই তাঁর চারপাশে রোগীদের ভিড় জমে যেত। অতি মনোযোগের সাথে তিনি প্রত্যেকটি রোগী পরীক্ষা করতেন। তখনকার দিনের নিয়ম অনুযায়ী তিনি হাসপাতালের রোগীদের ঘরে ঘরে ঘুরতেন না। কেননা, তা' ছিল অস্ত্রচিকিৎসকগণের কর্তব্য। যে রোগী চলতে ফিরতে অক্ষম ছিল, হার্ভে শুধুমাত্র তাদের ঘরেই যেতেন এবং তাদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করতেন।

হাসপাতালে শত শত রোগীর চিকিৎসা ও তাদের পর্যবেক্ষণই এনেছিল উইলিয়াম হার্ভের জীবনে এক নব উষার আলো। এখানেই তিনি হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচলের পদ্ধতি সম্বন্ধে নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন। কেই বা সেদিন জানতো যে এই চিন্তা-ভাবনাই তাঁকে একদিন অমরত্বের সন্ধান দিবে? প্রথমেই তিনি শতাব্দীর সেই পুরাতন মতবাদকে দূরে ঠেলে দিলেন। তিনি বললেন, এর মধ্যে গলদ রয়েছে। কিন্তু শীঘ্রই সে গলদ খুঁজে বের করতে সক্ষম হননি তিনি। তবে যতই দিন যেতে লাগলো এ ব্যাপারে তিনি তত বেশী নিশ্চিত হতে লাগলেন।

বছরের পর বছর ধরে শব-ব্যবচ্ছেদ করে চললেন তিনি। মানুষ, অন্য প্রাণী, পাখী, ব্যাঙ, সাপ, বিলাতী ইঁদুর কোন কিছুই তাঁর হাত থেকে রেহাই পেল না। এর প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁর মনে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঞ্চার করলো—মানবদেহে রক্ত চলাচল সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদটি সম্পূর্ণই ভুল বলে অনুমিত হলো।

চিকিৎসক হিসেবে উইলিয়াম হার্ভের নাম ডাক শীঘ্রই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। ইংল্যাণ্ডের রয়াল কলেজ অব ফিজিসিয়ান তাঁকে সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ লুমলিয়ান শিক্ষকের পদটি প্রদান করে। তিনিও আনন্দের সাথে তা' গ্রহণ করেছিলেন। এটা ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দের কথা। এর মাত্র এক বছর পরই তিনি তাঁর ইতিহাস বিখ্যাত বক্তৃতাবলী দান করতে শুরু করেন। এই বক্তৃতা থেকেই শুরু হলো শরীরবিজ্ঞানে তাঁর শ্রেষ্ঠতম অবদানের প্রথম পদক্ষেপ। বিশ্ব মানবের সামনে ব্যক্ত করলেন এক নতুন মতবাদ বন্ধন মুক্ত করলেন আধুনিক বিজ্ঞানের যাত্রাপথ।

উইলিয়াম হার্ভে প্রথমতঃ তাঁর শিক্ষক বৈজ্ঞানিক ফেব্রিসিয়াসের "ক্ষুদ্র দরজার" মতবাদটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেন। তারপর, একটার পর একটা পরীক্ষা চালিয়ে এর সত্যতা প্রমাণ করলেন। তিনি তাঁর শিক্ষকের অসম্পূর্ণ মতবাদটি সম্পূর্ণ করেন এবং কপাটিকাসমূহের কার্যাবলী বর্ণনা করে নতুন মতবাদ প্রচার করলেন। এতে তিনি বললেন, শিরার মধ্য দিয়ে আমাদের শরীরের রক্তকে একদিকে প্রবাহিত করার জন্য কপাটিকাগুলো কাজ করে থাকে। ধমনী হৃৎপিণ্ড থেকে সারা দেহে রক্ত বহন করছে এবং শিরা বলে অপর এক নালী এই রক্তকে পরিশোধনের জন্য আবার হৃৎপিণ্ডে নিয়ে চাচ্ছে।

পূর্বের একটা ধারণা ছিল, আমাদের শরীরে অতি উৎকৃষ্ট ও মলিন এই দুই প্রকার রক্ত প্রবাহিত হয়। পাকস্থলীই এসব রক্তের উৎস হিসেবে পরিগণিত হতো। বৈজ্ঞানিক হার্ভের কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই যেন গোলমেলে ঠেকলো। তিনি এ মতবাদ পরিত্যাগ করে বললেন, আমাদের শরীরের রক্ত কখনই দু'প্রকার হতে পারে না। শিরা ও ধমনীর রক্তের মধ্যে কোন

পার্থক্য নেই। শরীরের বিভিন্ন অংশে একই প্রকার রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং হৃৎপিণ্ড এই রক্ত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। এটা একটা পাম্প যন্ত্র বিশেষ। হৃৎপিণ্ড মাংসপেশী দিয়ে গঠিত। এই সব মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়ে কাজ করে। তারপর এলিয়ে পড়ে। সঙ্কোচনের সময় রক্তপূর্ণ হৃৎপিণ্ডের কামরা থেকে নিষ্কাশনের মাধ্যমে রক্ত বেরিয়ে আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে তা' প্রবাহিত হয় এবং পরে তা' শিরার মধ্য দিয়ে আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। এই প্রকার রক্ত-সঞ্চালন পদ্ধতি সব সময়ই অবিচ্ছিন্ন।

উইলিয়াম হার্ভে নিজে সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই প্রকাশ করতে চাইতেন না। এটা তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ গুণ। প্রকৃত অনুসন্ধানীরাই এরূপ হয়ে থাকেন। হার্ভে তাঁর গবেষণার বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে বারবার পরীক্ষা চালাতেন। এসব পরীক্ষার ফলাফল থেকে নিজের মতবাদ সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত হওয়ার পরও তিনি চুপচাপ বসে রইলেন। দীর্ঘ বার বছর ধরে তিনি তাঁর ছাত্রদের কাছে এ বিষয়ে শুধুমাত্র বক্তৃতাই দিলেন। ছাপার অক্ষরে তা' প্রকাশ করলেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর ছাত্রদের প্রায় কেউই সে-সময় এ মতবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি।

১৬২৮ খ্রীস্টাব্দে হার্ভে তাঁর বিখ্যাত মতবাদটি বই আকারে প্রকাশ করলেন। ছোট্ট সে বই; তথাপি ইংল্যাণ্ডের ডাক্তারী মহলে সাথে সাথেই তা' বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করলো। নতুনভাবে যাচাই না করা পর্যন্ত কেউই এর সত্যতা স্বীকার করতে রাজী হলো না। কিন্তু হার্ভের মতবাদটি নির্ভুল প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ এর বিরোধিতা থেকে নিবৃত্ত হলো না। অবশ্য এ বিরোধিতা বেশী দিন টেঁকেনি। শীঘ্রই প্রতিবাদের ঝড় শান্ত হলো। সবাই উইলিয়াম হার্ভের মতবাদটি মেনে নিলেন।

চারিদিকে উইলিয়াম হার্ভের নাম-ডাক আরও বেড়ে গেল। দেশ-বিদেশ থেকে অভিনন্দন এলো তাঁর কাছে। ইংল্যাণ্ডের রাজ-পরিবারের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পেল। রাজা প্রথম চার্লস্

হার্ভের আবিষ্কারে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং সাথে সাথেই তাঁকে নিজের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত করলেন। এমন কি, রাজা চার্লস্ হার্ভের গবেষণার জন্য অনেক রকম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করলেন।

উইলিয়াম হার্ভে ছিলেন মনে-প্রাণে বৈজ্ঞানিক। তিনি কখনই রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। দিনরাত শুধু নিজের গবেষণা নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করতেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের রাজ পরিবারের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। তাই, একমাত্র এই কারণেই গৃহযুদ্ধের সময় তাঁকে লণ্ডন পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। তথাপি হার্ভে কখনও তাঁর গবেষণাকার্য স্থগিত রাখেননি।

গৃহযুদ্ধের পর ইউলিয়াম হার্ভে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীরবিদ্যার উপর গবেষণা পরিচালনা করেন। তাঁকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ডক্টর অব মেডিসিন উপাধি প্রদান করা হয়। তিনি যখন অক্সফোর্ডে গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী তাঁর হোয়াইট হলের বাড়ীটি লুণ্ঠন করে। তারা তাঁর গবেষণার যন্ত্রপাতি লণ্ড-ভণ্ড করে এবং বই-পত্র সহ অন্যান্য দ্রব্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ফলে, আমরা বৈজ্ঞানিক হার্ভের আবিষ্কৃত অনেক মূল্যবান তথ্যাদি থেকে বঞ্চিত হই।

আজকের দিনের ন্যায় হার্ভের আমলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ বা পর্যাপ্ততা কোনটাই ছিল না। নানান প্রকার হাতুড়ে যন্ত্রপাতি দিয়ে তাঁদের গবেষণা করতে হতো। এমনকি, হার্ভের আমলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রও আবিষ্কৃত হয়নি। তাই তাঁকে প্রাণী ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গের দেহ পরীক্ষা করার জন্য এক প্রকার আতশী কাঁচ ব্যবহার করতে হতো। আবার সে কাঁচও তত বেশী শক্তিশালী ছিল না। কাজে কাজেই কোন কোন বিষয়ে তিনি শুধু অনুমান করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পর এসব অনুমান সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

আটষট্টি বছর বয়সে হার্ভে পুনরায় লণ্ডনে চলে আসেন। এই সময় তাঁর সুখ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। শেষ জীবনের বাকী

কয়েকটা দিন তিনি তাঁর ভাইদের সাথে বসবাস করতে মনস্থির করেন। এই সময় তিনি বাত ও অন্যান্য দুরারোগ্য রোগে ভুগছিলেন।

আস্তে আস্তে বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম হার্ভের জীবনের শেষ দিনগুলো ঘনিয়ে এলো। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল—উদ্যম কমে এলো ও কর্মক্ষমতা ব্যাহত হলো। ক্রমান্বয়ে তিনি বিকলাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হলেন, বাক্‌শক্তি রহিত হলো। এমনিভাবে মৃত্যুশয্যায় দিন কাটতে লাগলো তাঁর। অবশেষে, ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে জগৎবাসী শোকে মুহ্যমান হলো। উইলিয়াম হার্ভের ন্যায় একজন মহাবিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে গোটা বিশ্ব বঞ্চিত হলো।

বিজ্ঞান জগতে উইলিয়াম হার্ভের আবিষ্কার যুগ যুগ ধরে মানব সমাজে অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। কেননা, এরই ফলে আজকের মানুষ অতি সফলতার সাথে রোগ-শোক, ব্যথা-বেদনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলেছে। তাঁর আবিষ্কারের বিষয়বস্তু সকলের মানসপটে অমরত্বের আসন লাভ করেছে।

এনথনী লিউএন হুক

কালো মেঘে আকাশটা ছেয়ে গেছে। চারিদিক অন্ধকার। মুষলধারে বৃষ্টি ঝড়ছে। এমন সময় কে একজন বুড়ো ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নেই তাঁর। ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে একটা পাত্রে কিছু পানি নিয়ে সোজাসুজি আবার ঘরে ঢুকলেন। তারপর, সেই পাত্র থেকে একটা ছোট কাঁচের ফলকে এক ফোঁটা পানি রেখে নিজের তৈরী যন্ত্র দিয়ে তা' নিরীক্ষণ করতে লাগলেন তিনি। প্রথম দৃষ্টিতেই অবাক হলেন! কি আশ্চর্য! এতো জীব এলো কোথা হতে! মাত্র এক ফোঁটা পানিতে এতো জীব! এরা ভেসে বেড়াচ্ছে—সাঁতার কাটছে—ছুটাছুটি করছে! আনন্দে বুড়ো যেন লাফিয়ে উঠলেন। তারপর, পুনঃ পুনঃ দেখলেন। কিন্তু যতবারই দেখেন ততবারই বিস্মিত হলেন তিনি। হঠাৎ যেন মনটা সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠলো; হয়ত বা যন্ত্রের গোলমালবশতঃ এরূপ ঘটছে। তাই তিনি আবার নতুন যন্ত্র তৈরীর কাজে লেগে গেলেন।

পানিতে জীবের অস্তিত্ব

কাঁচ ঘসা আর সেই কাঁচ দিয়ে যন্ত্র তৈরী করাই ছিল এ বুড়োর কাজ। আপন মনে তিনি শুধু দিনরাত এই কাজই করতেন। একবার কোন রকমে একটা যন্ত্র তৈরী হলে তাকে আর পায় কে, অমনি দে ছুট্। সারাদিন এটা

ওটা সেটা নিয়ে নিজের তৈরী যন্ত্র দিয়ে তা' দেখতে থাকেন। ছোট ছোট সব জিনিস, যা' এমনি চোখে মোটেই দেখা যায় না—এই বুড়ো লোকটি তার সেই যন্ত্র দিয়ে সে-সব জিনিস নিরীক্ষণ করতেন। আর মাঝে মাঝে অবাক বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠতেন। পাড়ার লোকেরা এসব কাণ্ডকারখানা দেখে একে পাগলাটে বলতো।

এই পাগলাটে বুড়ো ছিলেন হল্যাণ্ডের ডেল্‌ফ্‌ট শহরের পৌরসভার একজন দ্বাররক্ষী। এঁর নাম ছিল এনথনী লিউএন হুক। ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর তারিখে তাঁর জন্ম। লিউএন হুকের পিতা ছিলেন সে সময়ের একজন সম্ভ্রান্ত লোক। কিন্তু ছোট বেলাতেই তার পিতৃ বিয়োগ ঘটে। তাঁদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। তাঁর গরীব মায়ের আশা ছিল অনেক। লিউএনের মা ভেবেছিলেন, ছেলে তাঁর বড় হয়ে লেখাপড়া শিখবে; তারপর, একজন নামজাদা সরকারী চাকুরে হবে—আরও কত কি! কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর কোনটাই বাস্তবে রূপ পেল না। বাদ সাধলো লিউএনের পিতৃ বিয়োগ। তাই, মাত্র ষোল বছর বয়সেই অর্থের অভাবে তাকে স্কুল ছাড়তে হলো।

তারপর, রুজি-রোজগারের তাগিদে কোন একটা মুদির দোকানে শিক্ষানবিশের কাজ নেন তিনি। আর দীর্ঘ একটানা ছয়টি বছর চালিয়ে যান এই কাজ। এরপর, হঠাৎ একদিন তিনি তাঁর এই চাকুরীতে ইস্তফা দিলেন। কি-যে খেয়াল তাঁর! এই দোকানে শিক্ষানবিশী কালীন তিনি সর্বপ্রথম এক প্রকার কাঁচের সন্ধান পান। এ কাঁচ কিন্তু ঘরের জানালা বা অন্য কোন পাত্রের কাঁচের ন্যায় নয়। এসব কাঁচ দিয়ে ছোট ছোট জিনিস বেশ বড় করে দেখা যায়। তাই এদের অপর একটা স্বতন্ত্র নামও রয়েছে। এরা লেন্‌স বা পরকলা নামে পরিচিত।

একটা সাধারণ পরকলা দিয়ে লিউএনকে মাঝে মাঝে কাজ করতে হতো। তিনি তা'দিয়ে কাপড়ের সুতা গুণতেন; আর মনে মনে ভাবতেন, এর চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী পরকলা দিয়ে কি কি এবং কত ক্ষুদ্র জিনিস দৃষ্টিগোচর হবে। এমনিভাবে আরও অনেক কিছু ভাবতেন তিনি।

কিন্তু সে-সব চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারতেন না। কেননা, দোকানে চাকুরী করে অবসর একদম ছিল না বললেই চলে। নানান কাজে দিন চলে যেতো, রাত্রি অনেক হতো, টেরও পেতেন না তিনি। তাই লিউএন মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার কোন ফুরসৎ নেই এখানে।

এরূপ যার মনের অবস্থা—তার কাছে অবসরবহুল চাকুরী ত' অনেক মূল্যবান বস্তু। এ যেন সাত-সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে পাহাড়ের ভিতর থেকে বহু কষ্টে পাওয়া সোনার কৌটায় লুকানো সাত রাজার ধন। তাই, পৌরসভার দ্বাররক্ষীর পদের আমন্ত্রণ পেয়ে লিউএন তা' একরূপ লুফেই নিলেন। এখন আর তাকে পায় কে? মুদির দোকানে চাকুরী-কালীন চিন্তা ভাবনাসমূহের বাস্তব কার্যকারণের পালা শুরু হলো। বিস্তর অবসর পেয়ে বহুদিনের পুঞ্জীভূত বাসনাকে কাজে লাগালেন। তিনি কাঁচ ঘষে ঘষে শক্তিশালী পরকলা তৈরীর কাজে লেগে গেলেন। এ ব্যাপারে লিউএন সফলকামও হলেন সত্বর।

তিনি কাঁচ ঘষতে ঘষতে হঠাৎ একদিন একটা নতুন রকমের যন্ত্র তৈরী করলেন। এটিই তাঁর আবিষ্কৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্র। তাঁর এই যন্ত্রে দুটো পরকলা অল্প দূরত্বে একটা ধাতুনির্মিত চোঙের মধ্যে বসানো ছিল। এর ভিতর দিয়ে অতি ছোট জিনিসও খুব বড় দেখা যেত। বর্তমানের তুলনায় এই যন্ত্রটি অনেক নিকৃষ্ট মানের। লিউএন হুকের নির্মিত যন্ত্র দিয়ে কাজ করতে বললে তোমরা হয়ত' বলবে, এ দিয়ে কি কখনও কাজ করা সম্ভব? কতই-বা এর দাম? বাজারে ত' সস্তা দামে এন্তার এ যন্ত্র কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু তোমরা শুনলে হয়তো আশ্চর্য হবে, বুড়ো লিউএন হুকের নির্মিত যন্ত্রটিই পৃথিবীর দ্বিতীয় অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এর পূর্বে, ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দে হল্যাণ্ডের জ্যাকসন নামক এক ব্যক্তি সর্ব প্রথম এই যন্ত্র নির্মাণ করেন। লিউএন হুক কিন্তু জ্যাকসনের আবিষ্কার সম্বন্ধে কোন খোঁজ-খবরই রাখতেন না।

পৌরসভার দ্বাররক্ষী! তার আবার যন্ত্র আবিষ্কার! একথা শুনে সে যুগের সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁকে মোটেই আমল দিতেন না। এদিকে

লিউএনও ছিলেন নিজ সাধনায় অটল। তিনি তথাকথিত সম্ভ্রান্তদের প্রতি করুণা করে বলতেন, ওরা সব অহমিকার মহাসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাই তিনি কখন ওদের সাথে মিশতেন না। আপন মনে তিনি নিজের কাজ করতেন।

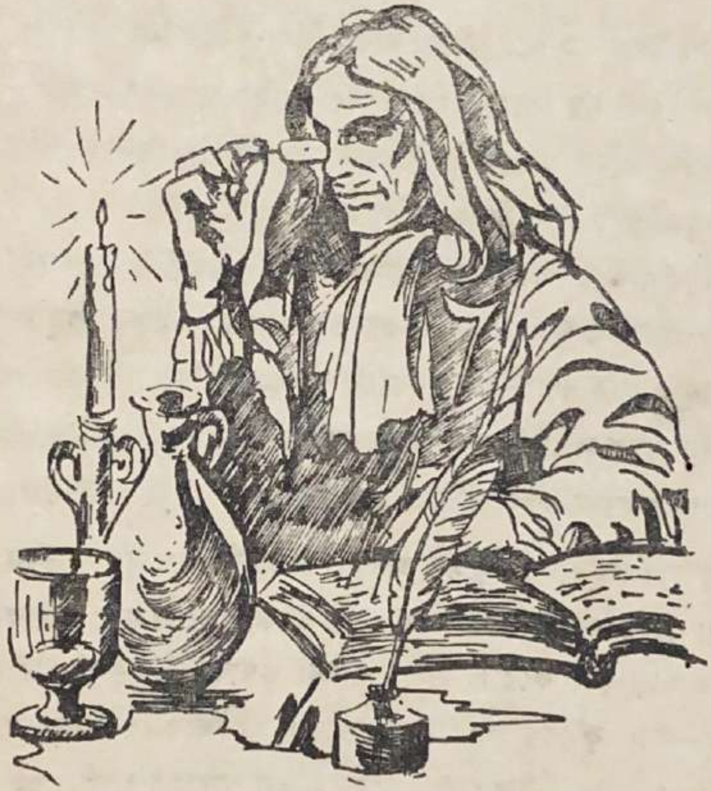

[নিজের তৈরী ছোট্ট যন্ত্রটি হাতে লিউএন হুক]

সে সময় উচ্চ সমাজে লাটিন ভাষা প্রচলিত ছিল। ওলন্দাজ ভাষায় কথা বলাকে তারা মনে-প্রাণে ঘৃণা করতো। ভদ্রলোকদের ভাষায়, ওটা কুলি-মজুর-চাষাদের ভাষা। লিউএন কিন্তু এই ওলন্দাজ ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানতেন না। লাটিনে তাঁর অক্ষর জ্ঞান ছিল মাত্র।

লিউএনের দুই স্ত্রী ছিলেন। তাঁর ছেলেমেয়ে ছিল জন কয়েক। এদের সম্বন্ধে সঠিকভাবে কোন কিছু জানা যায় না। তবে একথা সত্য যে তাঁর জীবদ্দশাতেই অধিকাংশ সন্তান-সন্ততির মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে এর অধিক কিছু আর জানা যায় না। কারণ, একজন

দ্বাররক্ষীর খোঁজ-খবর কেই-বা রেখেছে ? তা'ছাড়া বুড়ো লিউএন ছিলেন আপনভোলা—পাড়ার লোকেরা তাঁকে ছিট্‌গ্রস্থ বলে ভাব্‌তো। কেউই তাঁর সংথে মেলামেশা করতো না—সবাই মিলে একঘরে করে রেখেছিল। তাই তিনিও উপযাচক হয়ে কারও সাথে মিশতে চাইতেন না। আপন মনে শুধু নিজের তৈরী যন্ত্র নিয়ে এদিক-ওদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াতেন।

আজকের দিনের মানুষ চাঁদে যাওয়ার চেষ্টা করছে—মহাশূন্যে সাঁতার কাটছে—মঙ্গলগ্রহে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য একটার পর একটা কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপ করে পরীক্ষাকার্য চালাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক পেশাকে আজকাল সমাজের সবচেয়ে উঁচুতে স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। নতুন কিছু আবিষ্কারের জন্য নানান্ প্রকার সম্মানিত পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। আর এই আবিষ্কারের কথা সাথে সাথেই দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায়, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি প্রচার যন্ত্র মারফৎ ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু লিউএন হুকের যুগের অবস্থা তেমনটি ছিল না। তখন লোকের দুরারোগ্য রোগ হলেও ডাক্তার বা বদ্যি ডাকা চলতো না ; ডাকতে হতো ওঝা—যে ঝাড়-ফুঁক করে। সবাই ধারণা করতো, জিন বা পরীর আঁচড় লেগেছে—ঝাড় ফুঁকেই তা' সেরে উঠবে। একথার যে প্রতিবাদ করবে—তার আর রক্ষা নেই ; হয় জেল নতুবা জীবন হারাতে হবে। এই ছিল সে-যুগের বিধান। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে—এ সত্য বলার অপরাধে গ্যালিলিওকে জেলে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

কে কি বলছে বা করছে সেদিকে লিউএন হুকের কোন খেয়ালই ছিল না। তা' নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ও পেতেন কম। তিনি প্রায় সময়ই আপন মনে এক নতুন পৃথিবীর সন্ধান করতেন। আমেরিকা আবিষ্কার করে কলম্বাস গোটা দুনিয়ার শুধুমাত্র এক টুক্‌রো অংশ খুঁজে পেয়েছিলেন ; মঙ্গল গ্রহে জীবের সন্ধানে আধুনিক বিজ্ঞানীরা এখনও পরীক্ষাকার্য চালাচ্ছেন। আর আজ থেকে সাড়ে তিন শ' বছর আগে লিউএন হুক একটা নতুন জগৎ খুঁজে বের করেছিলেন। কত বড় মহান সে আবিষ্কার !

সেদিন তিনি বৃষ্টির এক ফোঁটা পানিতে যে-সব অসংখ্য প্রাণীকে সাঁতার কাটতে দেখেছিলেন—এরাই তাঁর সেই নতুন জগতের প্রাণী। অতি ক্ষুদ্র, খালি চোখে এগুলোকে মোটেই দেখা যায় না। দৃষ্টির অগোচরে সব সময় এরা বিচরণ করে। লিউএন হুকের আবিষ্কৃত এইসব প্রাণীকে আমরা 'জীবাণু' বলে থাকি।

নতুন জগতের সন্ধান পেয়ে বুড়ো লিউএনের আনন্দ আর দেখে কে! গোটা পৃথিবী যেন তাঁর হাতের মুঠোয় ধরা দিয়েছে। সম্মুখে তিনি যা পেলেন, সোজাসুজি তাই নিয়েই যন্ত্র দিয়ে দেখতে শুরু করলেন। কখনও বা বাজার থেকে ছোট মাছ কি মাংস সওদা করে এনেছে—লিউএন তক্ষুনি তাই নিয়ে পরীক্ষা করতে বসলেন। নিজের দাঁত থেকে ময়লা সংগ্রহ করে, মাথার চুল ছিঁড়ে, ভেড়ার পশম কুড়িয়ে নিয়ে সবকিছু তিনি নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা করলেন। এমনকি কখনও কখনও পথচারীদের যাত্রাপথ আগলিয়ে তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত লালা সংগ্রহ করে তা-ও বিশ্লেষণ করলেন।

দিনে দিনে বুড়ো লিউএনের উৎসাহ আর উদ্দীপনা অনেকগুণে বেড়ে গেল। তিনি খাওয়া-দাওয়ার কথা একরূপ ভুলেই গেলেন। যন্ত্র তৈরী আর তা' দিয়ে দৃষ্ট বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণের মধ্যেই দিনরাত ডুবে রইলেন। তিনি মৌমাছি নিয়ে গবেষণা করলেন; এর পাখা, মাথা, পা কোনটাই বাদ গেল না। সাথে সাথে পিঁপড়ে, মূত্র, ব্যাঙাচির লেজ, গোলমরিচের সুরুয়া, নর্দমার ময়লা প্রভৃতির উপর অনুসন্ধান চালালেন। এগুলোর মধ্যে ক্ষুদে জীবের সন্ধান পেয়ে বিপুল আনন্দে নেচে উঠলো তাঁর মন।

পৃথিবীর আনাচে-কানাচে অঢেল ক্ষুদে জীব বাস করছে। আমাদের নিঃশ্বাসে, আকাশে, বাতাসে, পানিতে, খাদ্য-দ্রব্যে, ধূলি-বালিতে রয়েছে এদের ছড়াছড়ি। অথচ; আশ্চর্যের বিষয় যে পৌরসভার একজন নগণ্য দ্বাররক্ষীর পূর্বে কেউই এতো বড় জগৎটার খোঁজ-খবরই জানতো না। এই দ্বাররক্ষীই সর্বপ্রথম এদের সাক্ষাত পেলেন, নিখুঁতভাবে এদের

বর্ণনা দিলেন ও ছবি আঁকলেন নির্ভুলভাবে। আজকের দিনের বিজ্ঞানীগণও বলেন, লিউএনের অঙ্কিত ছবিগুলো ও তার বর্ণনা দোষ-ক্রটি মুক্ত।

বুড়ো লিউএন হুক তাঁর নির্মিত অণুবীক্ষণ যন্ত্র অন্য কাউকে ব্যবহার করতে দিতেন না। কেননা, তিনি ছিলেন বড় খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক। তাঁর নির্মিত যন্ত্রে নতুন জগতের জীবদের দেখার বাসনা কেউ কখনও প্রকাশ করলে তাকে লিউএনের গবেষণাগারে আসতে হতো। নতুবা সে-ব্যক্তির মনের আশা কোন দিনই পূর্ণ হতো না।

দ্বিধাগ্রস্ত ও অনিশ্চিতমনা লোক ছিলেন লিউএন। নব নির্মিত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোন জিনিসই একবার দু'বার দেখে তার তৃপ্তি হতো না। বারবার তা পরীক্ষা করতেন। তাই তিনি মৌমাছির হুল বা কীট-পতঙ্গের পা, ডানা এসব পরীক্ষার করে সেগুলোর নমুনা মাসের পর মাস সংরক্ষণ করতেন। ফলে, অন্যান্য বস্তু পরীক্ষার জন্য তাঁকে আরও অনেক যন্ত্র তৈরী করতে হতো। এমনিভাবে তিনি প্রায় শ' খানেক অনুবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করেছিলেন। এজন্য তাঁকে প্রচুর কষ্টও স্বীকার করতে হয়েছিল। কেননা, এসব যন্ত্রের পরকলাও কাঁচ ঘষে ঘষে তিনি নিজ হাতেই প্রস্তুত করেছিলেন। বাজারে কেনা পরকলায় তাঁর মোটেও আস্থা ছিল না।

যখন তিনি পরীক্ষাকার্যে ডুবে থাকতেন, তখন প্রায়ই আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কথা ভুলে যেতেন। এজন্য পাড়া-প্রতিবেশী তাঁকে বিদ্রূপ করতো—কখনও কখনও বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠতো। কিন্তু রেনিয়ার দ্য গ্রাফ নামক লিউএন হুকের একজন প্রাণের বন্ধু প্রথম থেকেই তাঁর আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। গ্রাফ্ নিজেও ছিলেন একজন বৈজ্ঞানিক। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত রয়াল সোসাইটির কাছে বিজ্ঞান বিষয়ে সংবাদ সরবরাহ করতেন তিনি।

একদিন রেনিয়ার দ্য গ্রাফ লিউএন হুকের যন্ত্র নির্মাণ ও তাঁর পরীক্ষার কথা জানিয়ে রয়াল সোসাইটিতে চিঠি লিখলেন। সাথে সাথেই সোসাইটির সম্পাদকের কাছ থেকে উত্তর মিললো। তিনি লিউএনকে তাঁর আবিষ্কার

সম্পর্কে সব কিছু লিখে জানাতে অনুরোধ করলেন। লিউএন এই প্রস্তাবে সাড়া দিলেন। এর পূর্বে রয়াল সোসাইটি সম্বন্ধে তিনি কোন কিছুই জানতেন না। তিনি কথ্য ওলন্দাজ ভাষায় তাঁর আবিষ্কারের কথা লিখে জানালেন।

লিউএন হুকের আবিষ্কারের কথা জানতে পেয়ে সোসাইটির সভ্যদের মধ্যে এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হলো। তাঁদের মধ্যে বিস্ময়ের সীমা রইলো না। তাঁরা সবাই বললেন, এক অভূতপূর্ব আবিষ্কার ; এ আবিষ্কারে সত্যসত্যই একটা নতুন বিশ্বের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। রয়াল সোসাইটির সম্পাদক লিউএনের প্রথম পত্র পেয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং পরবর্তী আবিষ্কারের খবর শোনার জন্য গভীর আশা প্রকাশ করেন।

এন্থনী লিউএন হুক একানব্বই বছর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১৭২৩ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি রয়াল সোসাইটিতে তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে চিঠি লিখতেন, এসব চিঠিতে তিনি প্রায় সব কিছুই লিখে জানাতেন, প্রতিবেশীদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের কথা, নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খবরাদি কোন কিছুই বাদ যেত না। তিনি ছিলেন বড্ড সাদাসিদে ও নিরহংকার লোক। বিজ্ঞানের ইতিহাস পড়লে তোমরা সহজেই একথা জানতে পারবে, যাঁরা এ বিশ্বে কোন বড় কিছু আবিষ্কার করেছেন তাঁরা সবাই অত্যন্ত সরল ও নিতান্তই সাধারণ লোক।

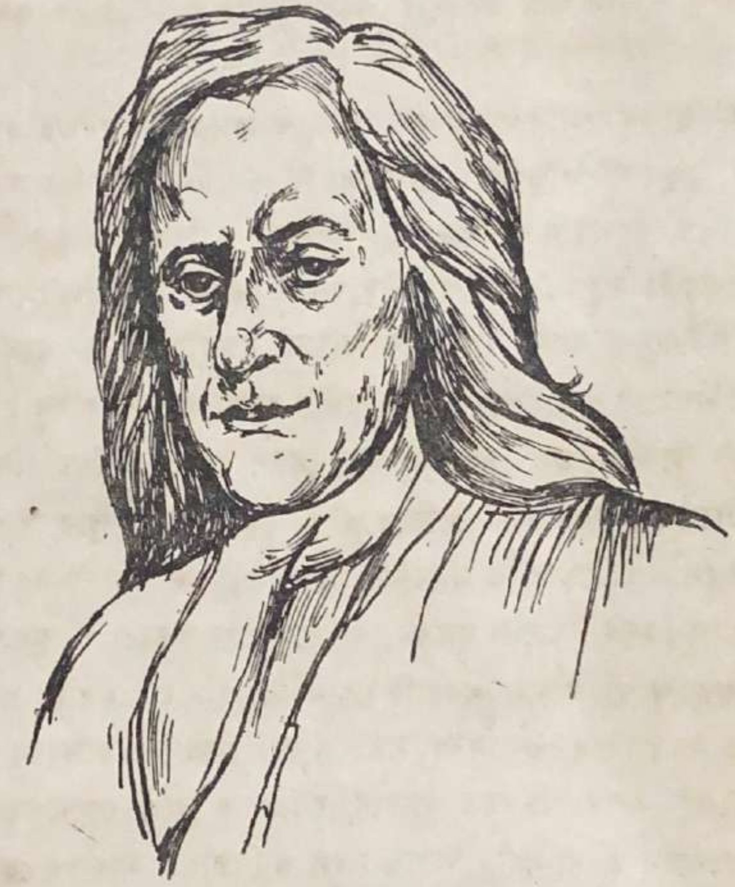

স্যার আইসাক নিউটন

১৬৪২ সাল। মহাবিজ্ঞানী গ্যালিলিও যে বছর মারা যান ঠিক ওই বছরের কথা। বছরটা সমাপ্তির পথে। বড়দিনের উৎসব সমাগত। ঘরে ঘরে এর প্রস্তুতি চলছে। ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি সবাই মিলে এ আনন্দের শরিক হবে। কত আনন্দ ! চারদিকে হাসি আর খুশির ছড়াছড়ি। কেউ বা ছুট্‌ছে—কেউ বা গাইছে আনন্দের গান। এমনি দিনে উল্‌সথ্‌র্পের কোন এক বিধবার ঘর আলোকিত করে জন্ম নিল একটি শিশু সন্তান। শিশুটির জন্মের তিন মাস আগেই তাঁর পিতৃ বিয়োগ ঘটেছে।

বিধবার এই শিশুই কালক্রমে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিল। তাঁর নাম আইসাক নিউটন। শুধু ইংল্যাণ্ডে নয়—সারা বিশ্বে যুগে যুগে শ্রদ্ধার সাথে সবাই এ নাম স্মরণ করবে। গ্যালিলিওর মৃত্যুতে বিজ্ঞানের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল—নিউটনের আবির্ভাবে তা' লাঘব হয়েছে। তিনি বিজ্ঞান জগতকে সম্পূর্ণ একটা নতুন পথে চালিত করেছেন। তাঁর এ সৃজনীশক্তি দেখে দুনিয়াবাসী চমৎকৃত হয়েছে। অনেকের মতে, নিউটনের আবির্ভাব না ঘটলে বিজ্ঞানের ইতিহাস হয়ত অন্যভাবে লেখা হতো।

নিউটন যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁর শারীরিক অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক, অত্যন্ত রোগাটে ছিলেন তিনি। তাঁর আকৃতি ছিল খুবই ছোট্ট। তিনি এতো লিকলিকে ছিলেন যে, তাঁর বাঁচার সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর মা প্রায়ই সন্দিহান হয়ে পড়তেন। কিন্তু এই শীর্ণ দেহ নিয়েই নিউটন ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হয়েছেন; কালে নাম করেছেন দুনিয়া জোড়া।

পিতৃহারা আইসাক মাত্র তিন বছর বয়সে মাতৃস্নেহ থেকেও বঞ্চিত হলেন। এই সময় তাঁর মায়ের অপর এক জায়গায় বিয়ে হয়ে যায়। রোগাটে ছেলেটির লালন-পালনের ভার পিতামহীর উপর ন্যাস্ত করে তিনি চলে যান নতুন ঘর-সংসার করতে। পিতামহীর অনাদর আর অবহেলায় ছেলেটি বড় হতে লাগলো; কিন্তু তাঁর লেখাপড়া হলো ব্যাহত। যখন তাঁর বয়স বার বছর তখন তাঁকে গ্রান্‌থান শহরের কোন এক গ্রামার স্কুলে সর্বপ্রথম ভর্তি করানো হয়। শহরটি ছিল আইসাকদের পল্লী থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত; তাই তাঁকে মিঃ ক্লার্ক নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে জায়গীর থাকতে হতো। এই পরিবারের সাথে তাঁদের পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিল।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই মিঃ ক্লার্কের সাথে আইসাক নিউটনের গভীর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। তিনি এই অনাথ শিশুটিকে অত্যন্ত আদর-যত্ন করতেন। যখনই সময় পেতেন তখনই বালক নিউটনের সাথে নিজেই খেলতেন। প্রায় সময়ই বাজার থেকে নানান ধরনের জিনিস কিনে শিশুটিকে উপহার

দিতেন। আর সেই ছেলেও তাই দিয়ে অবসর সময়ে হরেক রকমের যন্ত্রপাতি গড়তেন। খেলার বস্তু সব। মিঃ ক্লার্ক মাঝে মাঝে তাঁকে এসব কাজে উৎসাহ দিতেন। এই সময় স্টোরী নামের একটি ছোট্ট মেয়েও মিঃ ক্লার্কের পরিবারে বাস করতো। খেলার সাথী হিসেবে নিউটনের সাথে এই মেয়েটির বেশ হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। তিনি প্রায়ই মেয়েটির জন্য খেলনা ও খেলনার জন্য খাট-পালঙ্গ তৈরী করতেন। এসব জিনিস তৈরী করতে তিনি আনন্দও পেতেন বড্ড বেশী।

ছোট বেলা থেকেই নিউটন চিন্তাশীল ছিলেন; একাকী থাকতে ভালবাসতেন তিনি। প্রায়ই তাঁকে গভীর চিন্তায় মশগুল থাকতে দেখা যেত। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে অযথা গল্পগুজবে সময় নষ্ট করা তাঁর মোটেও পোষাত না। একটু অবসর পেলেই নতুন যন্ত্র গড়ার ফিকির খুঁজতেন। তিনি ছিলেন নম্র, শান্ত ও ভাবুক ধরনের লোক। খেলাধুলায় কোন দিনই আসক্তি ছিল না তাঁর।

যন্ত্রপাতি নির্মাণে নিউটনের জুড়ি মেলা ভার ছিল। কিন্তু লেখা-পড়ায় তিনি মোটেও মনোযোগী ছিলেন না। মাথাটা যেন সব সময়ই যন্ত্রপাতি নির্মাণের কায়দা-কৌশলই ছেয়ে থাকতো। এই সময় তাঁর মধ্যে ভবিষ্যতে অমরত্ব লাভের কোন লক্ষণই দেখা যেত না।

বয়সের সাথে সাথে আইসাক নিউটনের স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। তখনও তিনি গ্রামার স্কুলের ছাত্র। এই সময় নিউটনের জীবনে একটা ঘটনা ঘটলো; ঘটনাটি সামান্য হলেও অত্যন্ত মূল্যবান। কেননা, এথেকেই নিউটনের জীবনে এসেছিল এক আমূল পরিবর্তন—প্রতিভা স্ফূরণের দৃঢ় সঙ্কল্প। অথচ অন্যান্যদের জীবনে ত' এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু নিউটনের ন্যায় খুব কম লোকের জীবনেই তা' এতো গভীরভাবে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছে।

অতি সাধারণ সে ঘটনা। নিউটন সব সময়ই একাকী চুপ্‌চাপ থাকতেন। স্কুলের সাথীদের সাথে কোন দিনই হৈ হুল্লোড়ে যোগ দিতেন

না। তিনি ছিলেন নিরীহ গো-বেচারা। অথচ, একদিন তার ক্লাসের একটা হৃষ্টপুষ্ট ছেলে এসে তার সাথে আচ্‌মকা ঝগড়া বাধালো। ওই ছেলেটি ছিল বড্ড ঝগড়াটে, বদ-মেজাজী। কথায় কথায় সে সোজা নিউটনের পেটে কষে এক লাথি মারলো। তিনি ত' একদম হতভম্ব; ক্ষণিকের জন্য চিন্তা করলেন। তারপর, যাবে কোথায়? উত্তেজনায় লাফিয়ে পড়লেন ওই ছেলেটির ঘাড়ে। বেদম প্রহার করলেন; মারতে মারতে নাস্তানাবুদ বানালেন। পরিশেষে ছেলেটি সম্পূর্ণরূপে হেরে গেল।

নিউটনদের ক্লাসে ওই ঝগড়াটে ছেলেটিই ছাত্র হিসেবে সবার চেয়ে ভাল ছিল। সে প্রায় প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করতো। মারামারির পর নিউটন ভাবলেন, লিকলিকে স্বাস্থ্য নিয়েও জোরে এখন তিনি সবার সেরা—গায়ে যথেষ্ট জোর থাকা সত্ত্বেও ভাল ছাত্রটি তাঁর কাছে হার মেনেছে। এবার তিনি লেখাপড়ায়ও সবার সেরা হওয়ার জন্য সঙ্কল্প আঁটলেন। মনে মনে বললেন ইচ্ছা এবং সাধনা থাকলে পড়াশুনাতেও নিশ্চয়ই ওই ছেলেটিকে হার মানানো সম্ভব হবে। এরপর থেকে ক্লাসের পড়া নিয়ে তিনি বেদম খাটতে লাগলেন। চেষ্টা তাঁর বিফলে গেল না। শীঘ্রই তিনি বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন।

কিন্তু অপর এক বিপত্তি এসে তাঁর এ বিজয়ের পথে বাধ সাধলো। ক্ষণিকের জন্য তিনি থমকে দাঁড়ালেন। নিজে নিজেই প্রশ্ন করলেন, তবে কি তার মনের বাসনা পূর্ণ হবে না? সৎপিতার মৃত্যুর পর তাঁর মা আবার ফিরে এসেছেন উলস্‌থ্‌রপে। গোটা সংসারের ভার পড়েছে নিউটনের উপর। তাঁকে স্কুল ছাড়তে হয়েছে। জমিজমা চাষাবাদ দেখাশুনা করতে হবে তাঁকে। কিন্তু এসব বোঝা বইতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অপারগ। এটা তার অকর্মণ্যতার পরিচয় নয়; বস্তুতঃ এসবে তিনি মোটেই উৎসাহী ছিলেন না।

সপ্তাহে একদিন নিউটনকে জিনিসপত্র বেচা-কেনার নিমিত্ত বাগান বাড়ীতে যেতে হতো। কিন্তু এতে তার মোটেও মন বসতো না। বাগান

বাড়ীতে গিয়ে একজন পুরাতন ভৃত্যের উপর সব ভার ন্যস্ত করে পালিয়ে বাঁচতেন তিনি। এখান থেকে সোজা মিঃ ক্লার্কের রসায়ন বিপণীতে চলে যেতেন। এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে তিনি রসায়ন-শাস্ত্রের বইপত্র পড়াশুনা করতেন। উলস্‌থ্‌পের অবসর সময়গুলোতে তিনি বসে বসে নানান ধরনের প্রতিকৃতি পড়তেন কিংবা একাকী চিন্তায় মশগুল থাকতেন। নিউটনের এরূপ মতি দেখে তাঁর মা শীঘ্রই নিরাশ হলেন। তিনি বুঝলেন, কিছুতেই নিউটনকে দিয়ে একাজ করানো সম্ভব নয়। তাই তাঁকে লেখাপড়া শিক্ষার নিমিত্ত ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করালেন।

আঠার বৎসর বয়সে ক্যামব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু করলেন তিনি। এখানে তাকে মাঝে মাঝে শিক্ষকদের ফাই-ফরমায়েশ খেকে দিতে হতো। এতে তিনি কলেজে বেতন দেওয়ার হাত থেকে রেহাই পেতেন। প্রথম প্রথম ছাত্র হিসেবে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হননি। অতি সাধারণভাবে কলেজের পরীক্ষাগুলোয় উত্তীর্ণ হলেন। এই সময় হঠাৎ একদিন তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। প্রখ্যাত অধ্যাপক আইসাক ব্যারো তার সহায় হলেন। তিনি প্রায় সময়ই নিউটনকে পড়াশুনার বিষয়ে উৎসাহ দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই নিউটন ভালভাবে বি. এ পাশ করলেন।

পুনরায় তাঁর শিক্ষাজীবনে ক্ষণিকের বিরতি নেমে এলো। তখন ইংল্যাণ্ডে প্লেগ রোগের মহামারী দেখা দিয়েছিল। শহরের লোকজন সব প্রাণ ভয়ে এদিকে-সেদিকে পালিয়ে বাঁচলো। কলেজের কর্তৃপক্ষ কলেজ বন্ধ ঘোষণা করলেন। নিউটনকে উলস্‌থ্‌পে চলে আসতে হলো। কিন্তু এখানে কিছুতেই তাঁর মন টিকছিলো না; ট্রিনিটি কলেজে ফিরে যাওয়ার জন্য তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। রোগের প্রকোপ যখন উত্তোরত্তর বেড়েই চললো, তখন তিনি পরিস্থিতি বুঝতে পেরে গবেষণায় মনোনিবেশ করলেন। আলোক-বিজ্ঞান, গণিত, বল-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি গবেষণা করলেন। এই স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল।

১৬৬৫ সাল থেকে মাত্র দেড় বছর তিনি উলস্থর্পে অতিবাহিত করেন। এই স্বল্প সময়ে তিনি যে-সব গবেষণার সূত্রপাত করেছিলেন, পরবর্তী জীবনে তাঁর অধিক কালই ব্যয়িত হয়েছিল সেগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে। এতো অল্প সময়ে আশ্চর্যজনকভাবে তিনি একটার পর একটা নতুন সূত্র আবিষ্কার করলেন, নতুন যন্ত্র তৈরী করলেন আর অঙ্ক শাস্ত্রে দিলেন নতুন মতবাদ। ফলে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদদের সারিতে এসে দাঁড়ালেন। এই বছরই তিনি তাঁর বিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কিত গবেষণা শুরু করেন। শোনা যায় একদিন তিনি যখন বাগানে বসে ছিলেন সে সময় একটি আপেল ফল মাটিতে পড়তে দেখে তিনি চিন্তা করতে থাকেন, ফলটি গাছ থেকে পড়ে অন্য কোন দিকে না গিয়ে সোজা মাটিতে পড়ে কেন? কি এমন আকর্ষণী শক্তি রয়েছে? এ নিয়ে অনুসন্ধান কার্য করতে গিয়ে তিনি আরও ভাবলেন, কি করে এতো সুন্দরভাবে চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে। একটা অপরটার উপর ছিট্‌কিয়ে পড়ছে না কেন? এ থেকেই তিনি আবিষ্কার করলেন এক বস্তুর সাথে অপর বস্তুর আকর্ষণী শক্তির সম্বন্ধ। তিনি ঘোষণা করলেন, 'মহাকর্ষ' নামে এক প্রকার নতুন শক্তির কথা। চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহের সুনিয়ন্ত্রিত ঘূর্ণনের জন্য এই শক্তিকেই দায়ী করলেন তিনি।

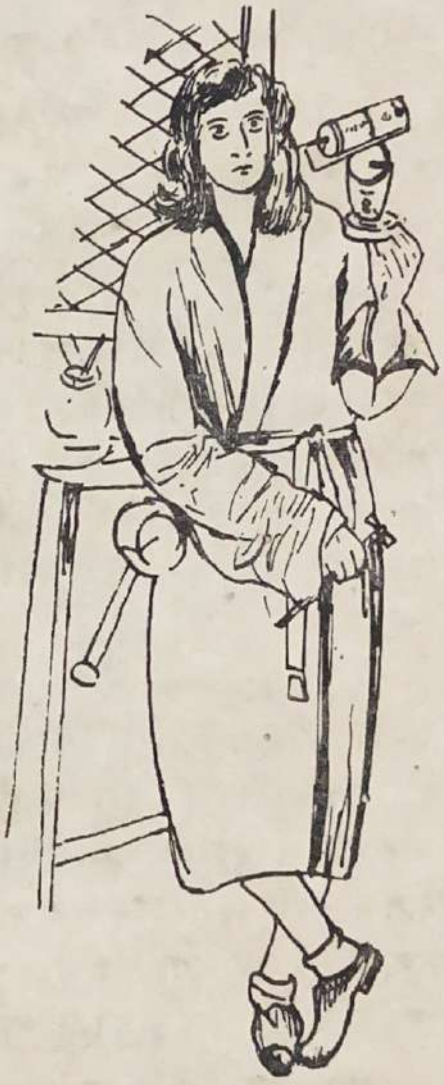

[নিজ প্রতিফলনী দূরবীন হাতে নিউটন]

এই সব মূল গবেষণা ছাড়াও তিনি নতুন ধরনের এক দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করলেন। তিনি তখন ট্রিনিটি কলেজের ফেলো। তাঁর নির্মিত দূরবীক্ষণটি ছিল মাত্র ছ' ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি ছিদ্রবিশিষ্ট।

যন্ত্রটি নিউটনের প্রতিফলনী দূরবীক্ষণ নামে সুপরিচিত। এর সাহায্যে দূরের জিনিসকে বড় করে দেখা যায়। যন্ত্রটির মধ্যে এক প্রকার প্রতিফলন আরশি ব্যবহৃত হয়, তাই এর নাম প্রতিফলনী দূরবীক্ষণ।

১৬৬৯ সালে নিউটনের শিক্ষক অধ্যাপক ব্যারো স্বীয় চাকুরীতে ইস্তফা দেন। তিনি ছিলেন অঙ্কের অধ্যাপক। ছাত্রাবস্থা থেকে নিউটনকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন; হয়ত সেই সময়ই তিনি নিউটনের মধ্যে সুপ্ত ভবিষ্যৎ প্রতিভার সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই তিনি অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর প্রিয় প্রতিভাধর ছাত্রের জন্য নিজ পদে ইস্তাফা দেন এবং নিউটনকে সেই পদে বহাল করেন। ফলে, নিউটন আর্থিক অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পেলেন।

ট্রিনিটি কলেজে অঙ্কের অধ্যাপক পদে বহাল হওয়ার বছর দুই পর নিউটন তাঁর প্রতিফলনী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দেন। এই যন্ত্রের বিবরণ পড়ে সোসাইটির সদস্যরা সবাই আনন্দিত হলেন। এতো সুন্দর যন্ত্র! তাঁরা সবাই মিলে সাথে সাথেই নিউটনকে রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত করলেন। ফলে, তিনি ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীদের এই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে সম্মানিত হলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ত্রিশ বছর।

আলো নিয়ে নিউটন বহু পরীক্ষা কার্য চালিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন, আমরা খালি চোখে যে আলো দেখে থাকি তা' সাতটি ভিন্ন ভিন্ন রং-এর সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি প্রিযম বা ত্রিশির কাঁচ দিয়ে যে পরীক্ষাটি চালিয়েছেন তা' নিম্নরূপ:

একদিন তিনি তাঁর নিজের ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করলেন। বাইরে থেকে আলো প্রবেশের কোন পথই রইলো না। ভিতরটা বেশ অন্ধকার হলো। তারপর তিনি জানালার মধ্যে একটা ছোট্ট ছিদ্র করলেন। এই ছিদ্রপথে অতি ক্ষীণ রেখায় ঘরের মধ্যে আলো প্রবেশ করলো। তিনি একটা প্রিযম সেই ছিদ্রপথে ধরলেন। এতে তিনি লক্ষ্য করলেন, প্রিযমের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসার পথে আলোর রেখাটি কিছুটা পথ বেঁকে যাচ্ছে; এটি আর পূর্বের ন্যায় মসৃণ ও গোলাকার নয়, এটি বিচ্ছুরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই ছড়িয়ে পড়া আলোর মধ্যে রয়েছে নানান্ রং-এর সংমিশ্রণ,—বেগুনী, গাঢ়নীল, নীল, হরিৎ, পীত, কমলা ও লাল প্রভৃতির আড়াআড়ি সমন্বয়।

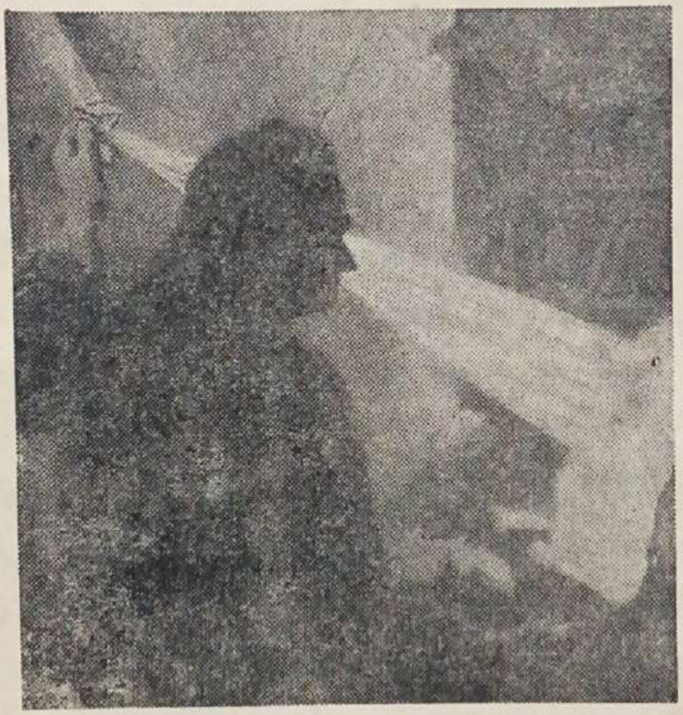

[নিউটন একটা প্রিযম সেই ছিদ্র পথে ধরলেন]

নিজের এ আবিষ্কারে নিউটন অনেক বেশী উৎসাহিত হলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, এ তো মাত্র একটি প্রিযমের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করানোর ফলে উৎপন্ন রং-এর সংখ্যা; তা' হলে অপর একটা প্রিযম-এর পিছনে বসিয়ে

দিলে আরও নতুনতর রং-এর সংখ্যা মিলতে পারে। কিন্তু তা' হলো না। তবে অপর একটা প্রিযম বসানোর ফলে পূর্বের রংগুলো অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হলো। এমনিভাবে নিউটন প্রিযম দিয়ে অনেকগুলো পরীক্ষাকার্য চালালেন। তিনি ছড়িয়ে পড়া বিচ্ছুরিত আলোকে পুনরায় একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এরপর নিউটন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। বিজ্ঞান জগতে এটি একখানি অমূল্য সম্পদ। মোট তিন খণ্ডে তা প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইখানি প্রকাশের সময় নিউটনকে ভয়ানক আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। এমন কি রয়াল সোসাইটিও সে অর্থ দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না। অবশেষে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিশ্ববিখ্যাত জ্যোর্তিবিদ হ্যালি তাঁকে এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। প্রিন্সিপিয়া প্রকাশের সাথে সাথেই পৃথিবীর সর্বত্র নিউটনের সুনাম ছড়িয়ে পড়লো।

হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফলে নিউটন এই সময় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। বেশ কিছুদিনের জন্য তিনি শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন। তখন তাঁর প্রায় রাতই বিনিদ্র কাটতো—ক্ষুধা, তৃষ্ণার অনুভূতি অনেক কমে গিয়েছিল। ফলে, রোগ মুক্তির পর তাঁর মেজাজটা খিটখিটে হয়েছিল এবং তিনি প্রায় ব্যাপারেই আনমনা হয়ে যেতেন। এই সময় তিনি একদিন ভোর বেলা নিজের পড়ার টেবিলে জ্বলন্ত একটা মোমবাতি রেখে বাইরে বেরিয়ে পড়েন। টেবিলে অনেক জরুরী কাগজ-পত্র ছিল। মোমবাতির আগুনে তা' পুড়ে সব ছাই হয়ে গেল। ফলে বিজ্ঞান জগতের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছিল।

১৬৯৬ সালে নিউটন সরকারী টাকশালের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলেন। এ কাজে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় পরে তিনি এর সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। নিউটন তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। ১৭০৩ সালে বিজ্ঞানের আবিষ্কারে তাঁর অমর কৃতিত্বের জন্য তাঁকে রয়াল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। এর দু'বছর পর

ইংল্যাণ্ডের রাণী তাঁকে স্যার উপাধিতে ভূষিত করেন। নিউটন সুদীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে রয়াল সোসাইটির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

নিউটনের যুগে তাঁর সম-সাময়িক আরও বেশ কয়েকজন নামজাদা বিজ্ঞানী ছিলেন। এঁদের মধ্যে লিব্‌নিজ, হাউক, ওয়ারেন, পিকার্ড প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এরা নিউটনের আবিষ্কার নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া-ফ্যাসাদ বাঁধাতেন। এজন্য মাঝে মাঝে নিউটনকে বিপদেও পড়তে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের কোন বিরোধিতাই টিক্‌তো না। নিউটনের ন্যায় এতো বড় বিজ্ঞানীর আবিষ্কার নিয়ে সন্দেহকে কেহই আমল দিত না। পরিশেষে তাঁরা সবাই তাঁর কাছে হার মেনেছিলেন।

নিউটন ছিলেন আত্মভোলা লোক; সব সময়ই পড়াশুনা আর গবেষণা নিয়ে ডুবে থাকতেন তিনি। প্রায় রাতই ঘন্টার পর ঘন্টা কাজের মধ্যে কাটিয়ে দিতেন তিনি। কাজের সময় কোন দিকেই তার খেয়াল থাকতো না। কখনও কখনও তিনি রাত তিন্‌টা চারটার পর বিশ্রাম গ্রহণ করতেন্। খেলাধুলা, বায়ু সেবন, আমোদ-ফুর্তি ইত্যাদি কোনটাতেই নিউটন কখনও যোগদান করতেন না। কেননা, এসবে অযথা সময় নষ্ট করা তাঁর পোষাত না। পড়াশুনা আর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়া এক মুহূর্ত সময়ও তিনি নষ্ট করতেন না।

কাজ করতে করতে প্রায়ই তিনি খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলে যেতেন। কোন কোন সময় তাঁকে খাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হতো। তিনি হয়ত কখনও ভোজনের টেবিলে গিয়ে দু' এক গ্রাস খাবার মুখে নিয়েই বিদায় হতেন। ট্রিনিটি কলেজে থাকাকালীন সময়ে কদাচিৎ তাঁকে সবার সাথে কলেজের ভোজ টেবিলে দেখা যেত। তিনি পোশাকের দিকেও নজর দেওয়ার সময় পেতেন কম। মাথা আঁচড়াতেন না বললেই চলে। আলু-থালু বেশে থাকতেন সব সময়। বিজ্ঞানী মন তাঁর—তাই বাহ্যিক চাকচিক্যের উপর তাঁর মোটেই আস্থা ছিল না। প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনেই একমাত্র ব্রত বলে মনে প্রাণে মেনে নিয়েছিলেন তিনি।

সময় বয়ে গেল ধীরে ধীরে। নিউটনেরও জীবন সায়াহ্ন ঘনিয়ে এলো। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর স্বভাবের সামান্যতম পরিবর্তনও দেখা যায়নি। তখনও তিনি পূর্বের ন্যায় বিনয়ী, নম্র ও লাজুক ছিলেন। অহঙ্কারের লেশমাত্রও তাঁর মধ্যে ছিল না। তাই অনেকেই মিসরের নীলনদের সাথে নিউটনের তুলনা করে থাকেন : উৎস যার জানা নেই অথচ শক্তির কথা সকলেই জ্ঞাত। এই মহা-মনীষীর নাম লোকে সকল যুগে সকল কালে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

১৭২৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীর কথা। পূর্ব থেকেই নিউটনের শারীরিক অবস্থা ভাল ছিল না। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক তাঁকে কোথাও না যাওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু নিউটন তা মানলেন না। কর্মের তাগিদে তিনি অসুস্থ শরীর নিয়েও রয়াল সোসাইটির সভায় হাজির হলেন। এ সভার সভাপতিত্ব করলেন তিনি। কিন্তু সভা শেষে বাড়ী ফেরার সাথে সাথেই তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হলো। তিনি শয্যাশায়ী হলেন। রোগ উত্তরোত্তর বেড়েই চললো। ১৮ই মার্চ তারিখে তিনি জ্ঞান হারালেন। এর দু'দিন পর তিনি মহাপ্রয়াণ করেন। ২৭শে মার্চ তারিখে ওয়েস্টমিনিস্টার এবীতে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

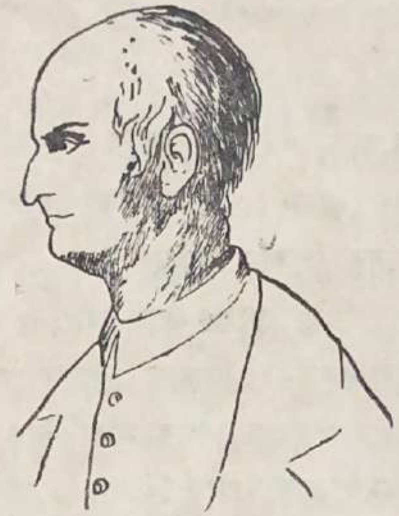

স্প্যালানজানি

রাত গড়িয়ে গেল, চারদিকে পাখীদের কল-কাকলী শোনা যাচ্ছে, ভোরের আকাশে আলোর আভা দেখা দিয়েছে, তবুও একজন লোক একখানা বই পড়ে চলেছেন নিবিষ্ট মনে। কোন দিকেই তাঁর খেয়াল নেই। ছোট্টো, অতি সাধারণ সে বইখানা ; এতদিন ধরে আজে-বাজে কাগজের সাথে নিতান্ত মলিন অবস্থায় তা' আলমারির কোণে পড়েছিল। অনেকেই হয়তো বইখানা নাড়াচাড়া করার পর অবজ্ঞাভরে তা ফেলে রেখেছিল। কেননা, এর বিষয়বস্তু ছিল তাদের বোধগম্যের বাইরে। কিন্তু আজ যে লোকটি বইখানা পড়ছেন—তিনি কিছুতেই তা ছাড়তে রাজি নন। এমন সুন্দর বইয়ের কদর কজনেই বা জানে ?

এই পাঠকের নাম স্প্যালানজানি। আমাদের দৃষ্টির অগোচরে যে অসংখ্য ক্ষুদে জীব রয়েছে, এগুলো কখনও আপনা-আপনি জন্মগ্রহণ করে না বলে যাঁরা প্রথম মত প্রকাশ করেন তাঁদের মধ্যে স্পালানজানি অন্যতম প্রধান। ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে লিউএন হুক নামক একজন ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক

সর্বপ্রথম এইসব জীবাণু দেখতে পান। তিনি একজন একাগ্রচিত্ত পর্যবেক্ষক ছিলেন, কাচ ঘষে ঘষে অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করা আর তা' দিয়ে ক্ষুদে জীব পর্যবেক্ষণ করাই ছিল তাঁর কাজ।

লিউএন হুকের মৃত্যুর ছ' বছর পর অর্থাৎ ১৭২৯ খ্রীস্টাব্দে ইটালিতে স্প্যালানজানি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন নামজাদা উকিল। স্প্যালানজানির পিতার একান্ত ইচ্ছা, ছেলেকে তিনি আইন ব্যবসায় শিক্ষা দিবেন। কিন্তু ছেলের এতে মোটেও মনোযোগ ছিল না। ছোটবেলা থেকেই স্প্যালানজানির বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি বিশের ঝোঁক ছিল। কিন্তু পিতার আদেশ অমান্য করার সাধ্য তাঁর ছিল না। কেননা, তিনি অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। তাই স্প্যালানজানিকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ওকালতি পড়তে হতো।

বাল্যকালে স্প্যালানজানি একাকী খেলতে ভালবাসতেন। তাঁর পিতা যখন নিজ কাজে ব্যস্ত থাকতেন তখন তিনি চুপি চুপি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়তেন। তারপর সোজা চলে যেতেন নদীর তীরে কিংবা পুকুরের ধারে। সেখানে একাকী বসে আপন খেলায় মশগুল থাকতেন। তাঁর খেলার সরঞ্জাম অপর দশটা ছেলের ন্যায় ছিল না। কখনও কখনও তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পুকুরের পানিতে আপন মনে ছোট ছোট চ্যাপ্টা ঢিল ছুড়তেন; আর সে ঢিলগুলো যখন পানির উপর লাফিয়ে ছুটতো তখন তিনি সে-দৃশ্য মনের আনন্দে উপভোগ করতেন। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করতেন—কি আশ্চর্য! ঢিলগুলো চট্ করে ডুবে না কেন?

বালক স্প্যালানজানি শুধু শান্ত পানিতে ঢিল ছুড়েই ক্ষান্ত হতেন না; তিনি আরও নানান রকমের খেলা খেলতেন। এদের কোন কোনটি ছিল বড় নিষ্ঠুর প্রকৃতির। বৈজ্ঞানিক মন তাঁর, রহস্যকে অনাবৃত করার মধ্যেই ছিল তাঁর আনন্দ। তাই তিনি কোথাও কোন রকমে একটা প্রজাপতি কিংবা শুঁয়োপোকা ধরতে পারলে খুশী মনে তা' পরীক্ষা করতেন, রূপগুণের বিচার করতেন না মোটেই। কেননা, এসব মামুলি জিনিসের উপর তাঁর

বিশ্বাস ছিল কম। সাথে সাথেই তিনি এগুলোর পা কেটে ফেলতেন, শরীর থেকে ডানাগুলো আলাদা করতেন, আবার নিজে নিজেই তা' লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরলেই স্প্যালানজানির মনটা ভীষণভাবে বিষিয়ে উঠতো। কেননা, পিতার সামনে বসে মিছামিছি কতকগুলো নীরস আইনের বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে তাঁর ভাল লাগতো না। তাঁর পিতা যখন নিজ কাজে চলে যেতেন, তখন তাঁকে আর পায় কে! খুশীতে ডগ্‌মগ্‌ হয়ে তিনি ঘরের জানালার ধারে গিয়ে বসে পড়তেন আর নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে থাকতেন আকাশের জ্বলজ্বলে তারকারাজির দিকে। পরদিন হয়তো খেলার সাথীদের কাছে তাঁর পূর্ব রাত্রের আকাশ পর্যবেক্ষণের কথা বলতেন, এতে সমবয়সীদের কাছে তাঁর দাম অনেকগুণে বেড়ে যেত। বন্ধুদের সবাই তাঁকে 'জ্যোতিষী' নামে ডাকতো।

কিন্তু বাপকে ফাঁকি দিয়ে আর কতদিন চলা যায়? তাই একদিন স্পালানজানি মনে মনে স্থির করলেন, বিজ্ঞান তাঁকে পড়তেই হবে—এই তাঁর পণ। তিনি আর সময় নষ্ট না করে সোজাসুজি ভিলিস্‌রিলির কাছে চলে যান। ভিলিস্‌রিলি সে-সময়ের একজন নামজাদা বিজ্ঞানী ছিলেন। স্পালানজানির সব কথা শুনে তিনি বললেন, 'অযথা তুমি কেন বোকার মত সময় নষ্ট করছো, তুমি যে কালে একজন বড় বিজ্ঞানী হবে!' তারপর তিনি সরাসরি স্পালানজানির পিতাকে বললেন, 'ওহে বোকা! আজে-বাজে কাজ চাপিয়ে ওর মাথাটাই যে তুমি খেতে বসেছ! ওযে গ্যালিলিওর মত খ্যাতনামা বিজ্ঞানী হবে! তোমরা দেখবে আমার কথা কত সত্য।'

যেমন ধমক তেমনি কাজ! এতবড় বিজ্ঞানীর কথা কি কেউ কখনও অবজ্ঞা করতে পারে? তাই স্পালানজানির পিতা তাঁকে তখন থেকে বিজ্ঞান পড়াতে মনস্থির করলেন। মনে মনে আক্ষেপ করলেন, অযথা আইন পড়ানোর চেষ্টা করে সময় নষ্ট করেছেন তিনি। ছেলেকে অনেক দোয়া করলেন, তারপর বিজ্ঞান শিক্ষার অভিপ্রায়ে রেজিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

এই সময় স্প্যালানজানির বয়স ছিল পঁচিশ বছর। ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবার সেরা ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হয়ে বলাবলি করতেন—নিশ্চয়ই এই ছেলে কালে একজন নামকরা বিজ্ঞানী হবে। তাঁদের সে-কথা সত্য বলে প্রমাণিত হতে খুব বেশী দেরি হলো না। শীঘ্রই স্প্যালানজানি বল-বিদ্যার উপর একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখলেন। তাঁর এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল, শান্ত পানিতে চ্যাপ্টা ঢিল ছুড়লে কেন তা' লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। এর ফলে চারদিকে তার নাম ডাক ছড়িয়ে পড়লো। এরপর স্প্যালানজানি অদৃশ্য প্রাণীদের কথা ভাবতে লাগলেন এবং লিউএন হুক কর্তৃক আবিষ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবদের জগৎ নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন।

একদিন স্পালানজানি রাস্তার পাশে একটা মরা ইঁদুর পড়ে থাকতে দেখলেন, তার দিন কয়েক পরেই দেখতে পেলেন যে সেখানে কোথা থেকে নানা রকমের পোকা গজিয়েছে। এ দেখে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগলো এতো পোকা এলো কোথা থেকে? এরা কি আপনা-আপনি গজিয়েছে, না আগে থেকেই 'প্রাণবন্ত' কোন কিছু ছিল? মৃতদেহ থেকে কি কখনও জীবনের উন্মেষ ঘটতে পারে?

সে যুগের ধারণা ছিল, আপনা-আপনিই এসব প্রাণীর জন্ম হয়। স্পালানজানি কিছুতেই তা' মানতে রাজী হলেন না। তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করলেন, যেমন করেই হোক এ রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করতে হবে। সেদিন থেকে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, কি করে এর একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তা' পেয়ে গেলেন। খুঁজতে খুঁজতে আলমারীর মধ্যে তিনি যে বইখানার সন্ধান পেলেন, তা'ই দিল তাঁকে তাঁর ইপ্সিত পথের নির্দেশ। এই বইয়ের মধ্যে খুঁজে পেলেন তিনি আলোর সন্ধান। বইটিতে একটি ছোট্ট পরীক্ষার কথা লেখা ছিল; পরীক্ষাটি নিম্নরূপ:

'দুটো কাচের পাত্র নিয়ে উভয়ের মধ্যে কিছু পরিমাণ মাংস রেখে এদের একটির মুখ খোলা রাখি এবং অপরটির মুখে পাত্লা ঢাক্নি

দেই। দেখা যাবে, মুখখোলা পাত্রের মধ্যে মাছি ঢুকে মাংসের উপর বসছে। কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে সেখানে নতুন জীবের আবির্ভাব ঘটেছে। শূককীটগুলো মাংসের উপর ঘোরাঘুরি করছে। কিন্তু অপর পাত্রটিতে? সেখানে কোন নতুন জীবনের উন্মেষ দেখা যাবে না।'

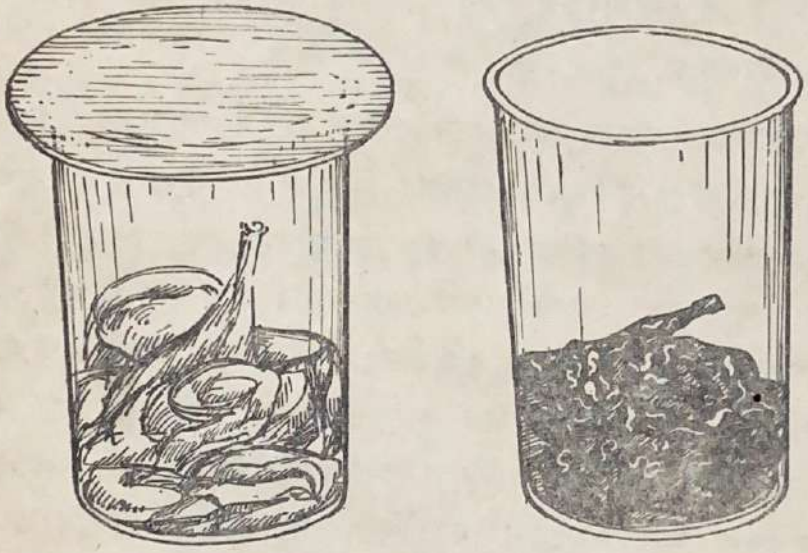

[দুটো কাচপাত্রে মাংস রেখে তার পরীক্ষা]

কত সহজ এই পরীক্ষা! স্পালানজানি আনন্দিত হলেন, তাঁর মনে নতুন প্রেরণা জাগলো। গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে ক্ষুদে প্রাণীদের বেছে নিলেন তিনি এবং কাল বিলম্ব না করে গবেষণা শুরু করলেন। লিউএন হুকের আবিষ্কৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে তিনি তাঁর পরীক্ষার কাজে লাগালেন। গবেষণায় তিনি এতোই মশগুল থাকতেন যে মাঝে মাঝে খাওয়া-দাওয়ার কথা একরূপ ভুলেই যেতেন। কাজ করতে করতে কখনও হয়তো বোতলের কাচ ভেঙ্গে হাত কেটে গেল—কি ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ঝরলো অনেক, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। দিবারাত্র তিনি গবেষণা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন।

এই সময় হঠাৎ একদিন তিনি শুনতে পেলেন, নীর্বাস নামক একজন

ধর্মযাজক ক্ষুদে প্রাণীদের সম্বন্ধে কতকগুলো আজগুবি খবর রটাচ্ছেন। নীর্বাসের মতে এসব ক্ষুদে জীব আপনা-আপনিই জন্মে থাকে—এটা তাঁর পরীক্ষার ফলাফল। নীর্বাস তাঁর কথা লণ্ডনের রয়াল সোসাইটিতে লিখে জানানোর সাথে সাথেই সোসাইটির সভ্যরা তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁকে সে সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত করেন। তাঁরা কেহই তখন পর্যন্ত স্প্যালানজানির গবেষণার কথা জানতেন না।

নীর্বামের পরীক্ষার কথা শুনে স্প্যালানজানি বললেন—এ কিছুতেই হতে পারে না; নীর্বামের পরীক্ষায় নিশ্চয়ই কোথাও গলদ রয়েছে। যেথানে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই সেখানে আপনা থেকে কিছুতেই জীবের জন্ম হতে পারে না। নির্জীব পদার্থ থেকে সজীব প্রাণী—এ যে অবিশ্বাস্য! স্পালানজানি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান; তাই তিনি প্রথমতঃ নীর্বামের পরীক্ষা-পদ্ধতি ভালভাবে যাচাই করে দেখলেন; তারপর তার ত্রুটির কথা উল্লেখ করে আপন পরীক্ষার ফল ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন—“এখন একথা আমাদের মেনে নিতে হবে যে, যেখানে প্রাণীর জন্ম হয় সেখানে কোন না কোন প্রাণবস্তু কিছু থাকে। আপনা-আপনি কোন জীবের জন্ম হয় না।”—তার একথা সে-সময়ের অনেক বিজ্ঞানীই মেনে নিয়েছিলেন।

এরপর স্পালানজানি আরও অনেক নতুন নতুন তথ্য বিশ্ববাসীকে জানালেন। কেমন করে এই সব ক্ষুদে জীব বেঁচে থাকে, কিই-বা তাদের প্রকৃতি, এক একটা ক্ষুদে জীব যে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লক্ষ লক্ষ জীবে পরিণত হয়, বংশবৃদ্ধি যে এদের একটি প্রধানতম বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি নানা কথা। আবার এসব ক্ষুদে জীব কোন কোন পদার্থের ছোঁয়াচ বা গন্ধ পেলেই মারা যায় কিংবা সেই পরিবেশ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করে তাদের কথা তিনি ঘোষণা করলেন।

এইসব আবিষ্কারের ফলে স্পালানজানির নাম সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লো এবং সবাই এক বাক্যে স্পালানজানিকে সে যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী

বলে মেনে নিলেন। রাজা ফ্রেড্‌রিক নিজের হাতে লেখা এক দীর্ঘ চিঠি পাঠালেন তাঁর কাছে। তাঁকে বার্লিন একাডেমী ও রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত করা হলো।

অষ্ট্রিয়ার রাণী মেরিয়া থেরেসা স্পালানজানির আবিষ্কারের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে পেভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে লিখে পাঠালেন। স্পালানজানিও দেখলেন যে এটাই তাঁর গবেষণা পরিচালনার প্রকৃত স্থান। তাই তিনি বিনা বাক্যব্যায়ে পেভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং আজীবন তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। এখানে থাকাকালীন অবসর সময়গুলোতে প্রায়ই তাঁকে তার গবেষণাগারে একাকী কার্যরত অবস্থায় দেখা যেত। তিনি কখনও অযথা সময় নষ্ট করতেন না।

[স্প্যালানজানি বসে বসে ভাবছেন]

স্পালানজানি যেমন চতুর ছিলেন, তেমনি ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। কোন একটা জিনিস চোখে পড়লেই তিনি চট্ করে সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারতেন। দেখা যেত, পরিশেষে তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি ধারণাই নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষক, ছাত্র, ছাত্রী সবাই তাঁর এ বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে সত্তর বছর বয়সে এই প্রতিভাধর মহান বৈজ্ঞানিকের জীবনাবসান ঘটে।

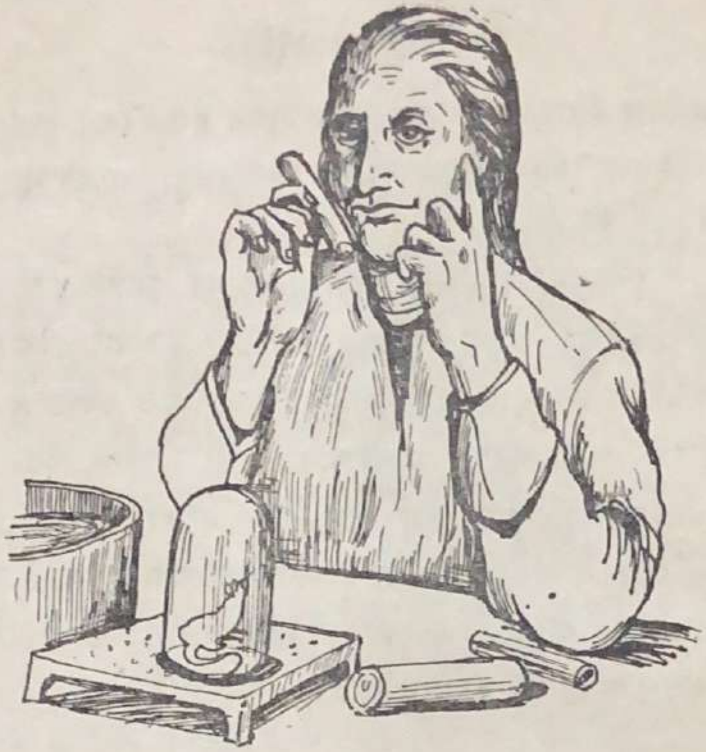

জোসেফ প্রিস্টলী

বিশাল আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকার একটি দেশ পেন্‌সেল্‌ভেনিয়ার পথে চলেছেন একজন লোক। শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে হলো। তাই ব্যথা আর বেদনায় মন তাঁর ভারাক্রান্ত। দেশবাসী তাঁকে চিনলো না। অজ্ঞতা আর ভুলের বশবর্তী হয়ে তারা তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতা করেছে—দেশ থেকে তাড়িয়েছে তাঁকে; অবশ্য সেজন্য তাঁর মোটেও আফসোস নেই। তিনি মনে মনে বললেন, দেশবাসী নিশ্চয়ই তাদের এ ভুলের জন্য একদিন না একদিন অনুতপ্ত হবেই। তখন হয়ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অমর অবদানের কথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবে।

লঘু অপরাধে যেখানে প্রাণের কোন ঝুঁকি নিতে হয় না, যেখানে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অপরাধে উন্মত্ত জনতা কোলাহল করে না, এরূপ একটি নিরিবিলি শান্ত ও সুন্দর পরিবেশে বসবাস করার জন্য সেদিন যে লোকটি পেন্‌সেল্‌ভেনিয়ার পথে রওয়ানা হয়েছিলেন তাঁর নাম জোসেফ প্রিস্টলী,

অক্সিজেন গ্যাসের আবিষ্কারক। ১৭৩৩ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের লীড্‌স শহরের কাছেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন তাঁতী। ছোট থাকতেই প্রিস্টলীর পিতা-মাতা উভয়েরই মৃত্যু হয়। ফলে তিনি তাঁর এক খালার বাড়ীতে লালিত-পালিত হন।

ছোটবেলায় প্রিস্টলী স্কুলে বেশীদিন লেখাপড়া শিখেননি। স্কুলে পড়ার মত আর্থিক অবস্থা তাঁদের ছিল না। তাই তিনি ঘরে বসেই ফরাসী ভাষা, ল্যাটিন ভাষা, এলজাবরা, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয়ে নিজে নিজেই শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর খালার প্রভাবে এই সময় থেকেই তিনি যাজক বৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রায় সময়ই তিনি ধর্ম বিষয়ে লেখাপড়া করতেন এবং মাঝে মাঝে তা' নিয়ে তাঁর খালার সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। পরবর্তীকালে তিনি ধর্ম বিষয়ে অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখেছিলেন ; তাঁর সে সব-প্রবন্ধ প্রচুর জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল।

বিজ্ঞানের প্রতি প্রিস্টলীর আকর্ষণ অনেকটা আকস্মিক। কিছুটা অভাবিত ; তিনি নিজেও একথা কোনদিন ধারণা করতে পারেননি যে তিনি কখনও বিজ্ঞানী হবেন—বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করবেন এবং সে গবেষণার ফলস্বরূপ বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর নাম অমর হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাই ঘটলো। ধর্মযাজক বৃত্তি চলাকালীন সময়ে হঠাৎ বিজ্ঞানের প্রতি তিনি মনোযোগী হয়ে পড়লেন। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর এ আকর্ষণ ক্রমান্বয়ে বেড়েই চললো। ঘরে বসেই তিনি বিজ্ঞানের টুকিটাকি নিয়ে পরীক্ষাকার্য শুরু করলেন।

প্রিস্টলী একদিন লোক মুখে শুনতে পেলেন যে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নামক একজন জগৎ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লণ্ডনে এসেছেন। তিনি ছিলেন আমেরিকার প্রথম নামকরা বৈজ্ঞানিক। একথা শোনার সাথে সাথেই প্রিস্টলীর মন আনন্দে নেচে উঠলো ; তিনি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের সাথে সাক্ষাৎ লাভের জন্য লণ্ডনের পথে ছুটলেন। ফ্রাঙ্কলিনের সাথে তাঁর পরিচয় হলো, তিনি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করলেন।

অবশেষে প্রস্তাব করলেন, তড়িৎ-বিজ্ঞান নিয়ে লেখা একখানা জনপ্রিয় বইয়ের অভাবের কথা। ফ্রাঙ্কলিন অনেক গুরুত্বের সাথে তাঁর মতামত শুনলেন এবং পরে প্রিস্টলীর উপরই সে-বই লেখার ভার অর্পণ করলেন।

পূর্বের বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, যদি এক টুক্‌রো কাঁচকে পশম দিয়ে ঘষা যায় তবে সেই কাঁচ কাগজের মত হাল্‌কা জিনিসকে সহজেই আকর্ষণ করে। তাঁরা অনুমান করতেন যে কাঁচের আকর্ষণী শক্তি এর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য আরও অনেক জিনিসের এরূপ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনই সর্বপ্রথম তাঁদের সে পুরাতন ধারণা পাল্‌টে দিলেন। তিনি বললেন, কাঁচের এই আকর্ষণী শক্তি বিদ্যুৎ ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাঁর এ আবিষ্কার শতাব্দীর সেই পুরাতন ভুল ধারণাকে দূরীভূত করলো, বিজ্ঞান জগতে আনলো যুগান্তর!

বেঞ্জামিনের ন্যায় এতো বড় মহান বিজ্ঞানীর অনুরোধ শিরোধার্য বলে মেনে নিলেন প্রিস্টলী। এতে তিনি উৎসাহও পেলেন প্রচুর। বাড়ীতে ফিরেই বিদ্যুৎ নিয়ে বই লেখার কাজে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু এ বই লিখতে শুরু করে মাঝে মাঝে তিনি বাধা প্রাপ্ত হলেন। কেননা, সে সময় তড়িৎ-বিজ্ঞান ছিল অত্যন্ত অনুন্নত। তাই কোন কোন বিষয়ে তাঁকে স্বয়ং কতকগুলো পরীক্ষাকার্য চালাতে হলো। আর এসব পরীক্ষার মাধ্যমেই তিনি বহু বিতর্কমূলক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন যে, কার্বন বা অঙ্গার একটি সুন্দর বিদ্যুৎ পরিবাহী দ্রব্য।

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে প্রিস্টলীর লেখা 'বিদ্যুতের ইতিহাস ও তার বর্তমান অবস্থা' নামক বিখ্যাত বইখানি প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশের সাথে সাথে তাঁর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানী মনের দেখা মিললো এতে। এ বই পড়ে সবাই মুগ্ধ হলো। প্রত্যেকেই জানতে পারলো তড়িৎ-বিজ্ঞানে প্রিস্টলীর মৌলিক আবিষ্কারের কথা।

বইখানি প্রকাশিত হওয়ার এক বৎসরের মধ্যেই তাঁকে রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত করা হলো।

তড়িৎ-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা শুরু করলেও পরবর্তী কালে জোসেফ প্রিস্টলী রসায়ন-বিদ্যার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হন। তাঁর এ আকর্ষণ ছিল অনেকটা অভাবিত। তিনি যখন ইংল্যাণ্ডের লীড্‌স শহরে বসবাস করতেন, সেই সময় তাঁর বাড়ীর পাশেই একটা মদ্য চোলাই-এর কারখানা ছিল। প্রায় দিনই তাঁদের বাড়ীটি মদের গন্ধে ভরপুর হয়ে থাকতো। বেশ কিছুদিন ধরে এরূপ গন্ধ গ্রহণের পর তাঁর বিজ্ঞানীমন স্বভাবতই এ নিয়ে গবেষণার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠেছিল।

জোসেফ প্রিস্টলী একনিষ্ঠভাবে রসায়ন নিয়ে একটার পর একটা পরীক্ষা-কার্য চালালেন। ফলে, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করলেন 'কার্বন ডাই-অক্সাইড' নামক এক প্রকার নতুন বায়বীয় পদার্থ। কিন্তু সেদিন তিনি এর সঠিক নামকরণ করতে সক্ষম হননি। তিনি তাঁর আবিষ্কৃত পদার্থ-টিকে "স্থির বায়ু" নামে অভিহিত করেছিলেন। কেননা, তখনকার দিনে বায়বীয় পদার্থসমূহকে নানান রকমের "বায়ু" বলে অভিহিত করা হতো। আজকের ন্যায় বৈজ্ঞানিক নামকরণের পদ্ধতি সে-সময় প্রচলিত ছিল না।

অত্যন্ত সহজ উপায়ে এই নতুন পদার্থটি আবিষ্কার করেছিলেন জোসেফ প্রিস্টলী। তিনি একদিন নিজ গবেষণাগারে পরীক্ষাকার্য চালাতে চালাতে একটা পাত্রে কিছু খড়িমাটি নিয়ে তার মধ্যে সাবধানতার সাথে ধীরে ধীরে কিছু সালফিউরিক এসিড ঢাললেন। আর সাথে সাথেই লক্ষ্য করলেন যে, পাত্রটির মুখে লাগানো অপর একটি নল দিয়ে এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ বেরিয়ে আসছে। এই পদার্থটিই তার আবিষ্কৃত "স্থির বায়ু"।

"স্থির বায়ু" নিয়ে জোসেফ প্রিস্টলী আরও নানান রকমের পরীক্ষাকার্য চালালেন। একদিন তিনি এই বায়ুকে পানির মধ্য দিয়ে পরিচালিত করে সোডার পানি আবিষ্কার করলেন। আজকাল বাজারে তোমরা যে হরেক রকমের ঠাণ্ডা পানীয় বা 'কোল্ড ড্রিঙ্ক' দেখে থাক তা' সবই প্রিস্টলীর

আবিষ্কৃত সোডার পানি থেকে প্রস্তুত হয়। তখনকার দিনেও এই সোডার পানি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এটি আবিষ্কারের অল্প দিনের মধ্যেই একটা কারখানা বসিয়ে শুধুমাত্র নৌ-সেনাদের মধ্যে এই পানীয় দ্রব্যটি সরবরাহ করা হতো। কেননা, এর ফলে তারা একটি দুরারোগ্য রোগের হাত থেকে রেহাই পেতো। রয়াল সোসাইটি প্রিস্টলীর এ আবিষ্কারে মুগ্ধ হয়ে তাকে "কপ্‌লে পদক" উপহার দেন।

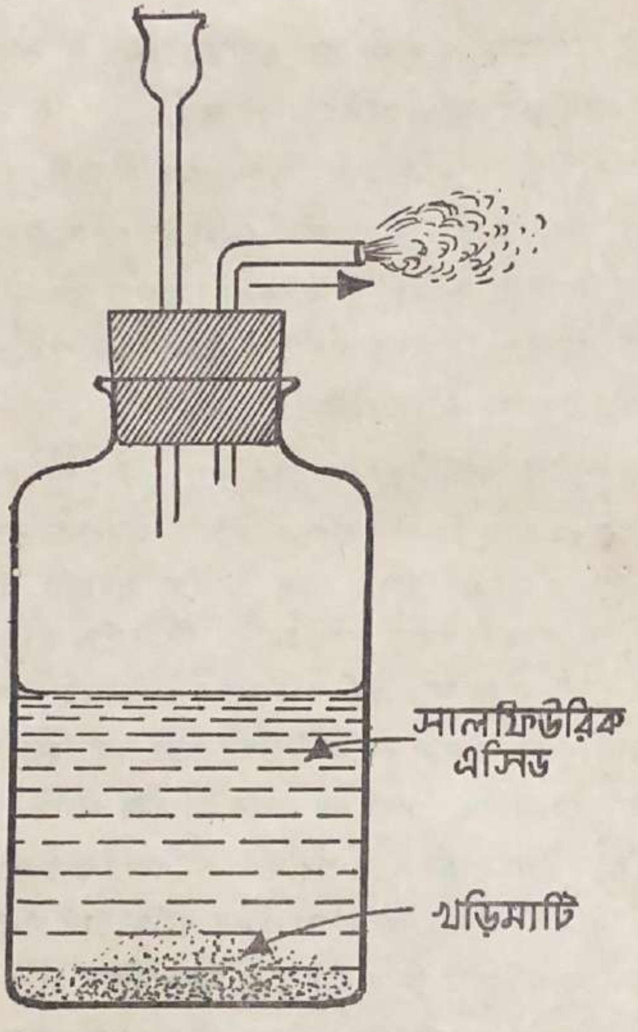

[স্থির বায়ুর পরীক্ষা]

প্রিস্টলীর যুগে রসায়ন-শাস্ত্র মোটেও উন্নত ছিল না। আলকেমিবিদদের প্রচারিত আদিকালের সেই মতবাদগুলো তখনও সবাই মেনে

চলতেন। তাঁরা মনে করতেন, দ্রব্যসমূহ 'ভস্ম, আগুন, বায়ু ও পানি' এই চারিটি প্রধান উপাদান দিয়ে গঠিত। প্রিস্টলীর যুগে এই ধারণার সামান্য কিছু পরিবর্ধন হয়েছিল মাত্র। তখন আলকেমিবিদদের ভস্মকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল, যেমন পারাযুক্ত, কাঁচবৎ ও দাহ্য দ্রব্য। কিন্তু তবুও তাঁরা ভাবতেন, এসব কিছুর মূলেই রয়েছে 'ফ্লোজিসটন' নামক এক প্রকার দ্রব্য। 'ফ্লোজিসটন' ছাড়া কোন কিছুই তৈরী হতে পারে না।

'ফ্লোজিসটন' কথাটি গ্রীক শব্দ 'ফ্লোজিসটস' থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দগ্ধ। আলকেমিবিদদের প্রচারিত মতবাদেও বলা হতো, সব রকমের দাহ্য বস্তুই 'ফ্লোজিসটন' দিয়ে প্রস্তুত। আগুনে পুড়লে এটা উড়ে যায়, থাকে শুধু ভস্ম। এই ভস্মের মধ্যে 'ফ্লোজিসটন' দ্রব্যটি পুনঃস্থাপন করতে পারলেই আদি দ্রব্যটি ফিরে পাওয়া যায়। যে-সব দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায়, কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, সেগুলোকে আদর্শ 'ফ্লোজিসটন' বলা হয়। জোসেফ প্রিস্টলী আলকেমিবিদদের এই মতবাদটি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া।

১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১লা আগস্ট তারিখের "অক্সিজেন" আবিষ্কারই প্রিস্টলীর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। এটিই তাঁর বিখ্যাত আবিষ্কারগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান। অথচ তিনি কোন একটি পূর্ব-পরিকল্পিত পরীক্ষার মাধ্যমে তা' আবিষ্কার করেননি। এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল হঠাৎ—অন্য একটি পরীক্ষাকার্য করতে গিয়ে অক্সিজেনের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি। সেদিন তিনি একটা পাত্রে কিছু মারকিউরিক অক্সাইড নামক একপ্রকার দ্রব্য নিয়ে উত্তাপ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন যে পাত্রটি থেকে এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ বেরিয়ে আসছে। তিনি এই পদার্থটিকে পরে কতকগুলো পাত্রে সংগ্রহ করলেন। তারপর, এই সংগৃহীত পদার্থ দিয়ে অনেকগুলো পরীক্ষাকার্য চালালেন। এক সময় একটি পাত্রে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি প্রবেশ করালেন। সাথে সাথেই মোমবাতিটি সতেজ শিখায় জ্বলে উঠলো। নতুনের আবিষ্কারে আনন্দিত হলেন তিনি। এই পদার্থটি দিয়ে আরও পরীক্ষাকার্য চালালেন।

একদিন প্রিস্টলী তাঁর সংগৃহীত বায়বীয় পদার্থের পাত্রে একটা জীবন্ত ইঁদুর ঢুকিয়ে পাত্রটির মুখ বন্ধ করলেন। তারপর লক্ষ্য করলেন, এই পাত্রের মধ্যে ইঁদুরটি অনেকক্ষণ বেঁচে রইলো। সাধারণ বায়ুপূর্ণ পাত্রে রক্ষিত ইঁদুরের আয়ুষ্কাল অপেক্ষা এটির আয়ুষ্কাল অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী হলো। এ থেকে তিনি বললেন, এই পদার্থটি বাতাসেরই একটি উপাদান। এই উপাদানটি মোমবাতি জ্বলতে সহায়তা করে এবং প্রাণীসমূহ বেঁচে থাকার এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রিস্টলী কিন্তু এই পদার্থটির নামকরণ করতে সক্ষম হননি। অপর একজন বৈজ্ঞানিক, এণ্টনী ল্যাভয়সিয়া এর নামকরণ করেছিলেন 'অক্সিজেন'।

প্রিস্টলী এই পদার্থটি নিয়ে আরও ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পরীক্ষার ফলাফল থেকে বলেছিলেন, মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের সাহায্যে কিংবা আগুন জ্বালিয়ে প্রতিনিয়তই এই পদার্থটি নিঃশেষ করছে। তবে, উদ্ভিদ জগৎ 'অক্সিজেন' ত্যাগের মাধ্যমে সে ক্ষতিপূরণ করে থাকে। তাই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সব সময়ই নির্মল থাকে। নতুবা পৃথিবীতে জীবজন্তু কোন কিছুই বাঁচতে পারতো না, এটা ধু ধু শ্মশানের ন্যায় মনে হতো।

'অক্সিজেন' ছাড়া জোসেফ প্রিস্টলী আরও অন্যান্য অনেকগুলো বায়বীয় পদার্থ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। এর ফলে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন অনেক নতুন নতুন দ্রব্য। তাঁর আবিষ্কৃত দ্রব্যসমূহের মধ্যে এমোনিয়া, নাইট্রোজেন, নাইট্রিক অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আর্থিক দিক থেকে প্রিস্টলীর অবস্থা কখনই স্বচ্ছল ছিল না। জীবনে তিনি কখনও ধনী হওয়ার স্বপ্নও দেখতেন না। উপরন্তু টাকা-পয়সা জমিয়ে ধনী হওয়াকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। তাই তিনি তাঁর আবিষ্কারকে অল্প খরচে সহজলভ্য করার চেষ্টা করতেন। তাঁর এই মহৎ চেষ্টার ফলস্বরূপ তিনি "বায়ুধারী পাত্র" নামক যন্ত্রটি আবিষ্কার করে-

বায়বীয় পদার্থ সংগ্রহের জন্য রাসায়নিক পরীক্ষাগারগুলোতে আজও এই পাত্রটির বহুল ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। পানির উপর এই জাতীয় পদার্থ সংগ্রহের জন্য এটি একটি অভিনব যন্ত্র। এছাড়াও প্রিস্টলী পানিতে দ্রবণীয় পদার্থসমূহকে পারদের উপর সংগ্রহের পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছেন।

এই সময় একদিন তিনি বৈজ্ঞানিক ক্যাভেনডিশের আবিষ্কৃত "প্রজ্জ্বলনীয় বায়ুর" (পরে এই বায়ুর নামকরণ হয়েছিল—হাইড্রোজেন) কথা শুনতে পেলেন। এর গুণাবলীর কথা তখনও সবার অজ্ঞাত ছিল। তিনি এই বায়ু নিয়ে পরীক্ষা কার্য শুরু করলেন। প্রিস্টলী একদিন একটি চোঙার ন্যায় লম্বা পাত্রে কিছু পরিমাণ লেড অক্সাইড নিলেন এবং পাত্রটি "প্রজ্জ্বলনীয় বায়ু'তে পূর্ণ করে মুখ বন্ধ করলেন। তারপর, আস্তে আস্তে তাপ দিতে লাগলেন। তাপের মাত্রা বৃদ্ধি করার কিছুক্ষণ পর তিনি পাত্রটির তলায় কিছু পরিমাণ লেড বা সীসা ধাতুর আবির্ভাব দেখতে পেলেন। পাত্রটি ঠাণ্ডা হলে দেখা গেল, এর গায়ে শিশিরের ন্যায় বিন্দু বিন্দু পানির ফোটা জমেছে। কিন্তু সেদিন এই পানির কণা সৃষ্টির কোন কারণ বলতে সক্ষম হননি তিনি। তাঁর বহু পরে সবাই জানতে পেরেছিলেন যে, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন নামক এই দু'টি বায়বীয় পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণে পানির সৃষ্টি হয়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার আনন্দেই প্রিস্টলী নানান ধরনের পরীক্ষাকার্য চালাতেন। এ থেকে অর্থ উপার্জনের কোনরূপ অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। বন্ধু-বান্ধবদের উৎসাহের জন্য তিনি প্রায়ই এলোমেলোভাবে পরীক্ষা চালিয়ে তাদের কৌতূহল বৃদ্ধি করতেন। এখনকার ন্যায় জোসেফ প্রিস্টলীর আমলে স্প্রিট বাতি বা বুনসেন বাতি বলে কোন কিছুই ছিল না। তাই, তিনি তাঁর পরীক্ষাকার্যে সুবিধার জন্য একটা বড় রকমের পরকলা ব্যবহার করতেন। এটি ছিল গোলাকার ও বারো ইঞ্চি ব্যাসার্ধসম্পন্ন। তিনি এই পরকলার সাহায্যে সূর্যে রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে তাই দিয়ে তাপ উৎপাদক

বাতির কাজ চালাতেন। প্রিস্টলীর বন্ধু-বান্ধবরা তাঁর এসব কলা-কৌশল দেখে মুগ্ধ হতেন এবং প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন।

ইতিমধ্যেই প্রিস্টলীর সুনাম দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফ্রান্সের বিজ্ঞান একাডেমী তাঁর মহান আবিষ্কারে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে এর সদস্য পদে নির্বাচিত করেন। অন্যান্য স্থান থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হলো। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে বার্মিংহাম থেকে তথাকার গির্জার পুরোহিতের পদ গ্রহণের আমন্ত্রণপত্র পেলেন এবং তিনি তা' সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করলেন। বার্মিংহামে বসবাসের বাসনা তিনি পূর্ব থেকেই মনে মনে পোষণ করতেন; কেননা এই সময় সে যুগের বড় বড় চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীগণের অধিকাংশই এখানে বাস করতেন। এদের মধ্যে রয়েছেন স্যার উইলিয়াম হার্সেল, স্মীটন, ডারউইন, জেমস ওয়াট প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সবাই প্রায় প্রতিমাসে একটি করে সভায় মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিষয় আলাপ-আলোচনা করতেন।

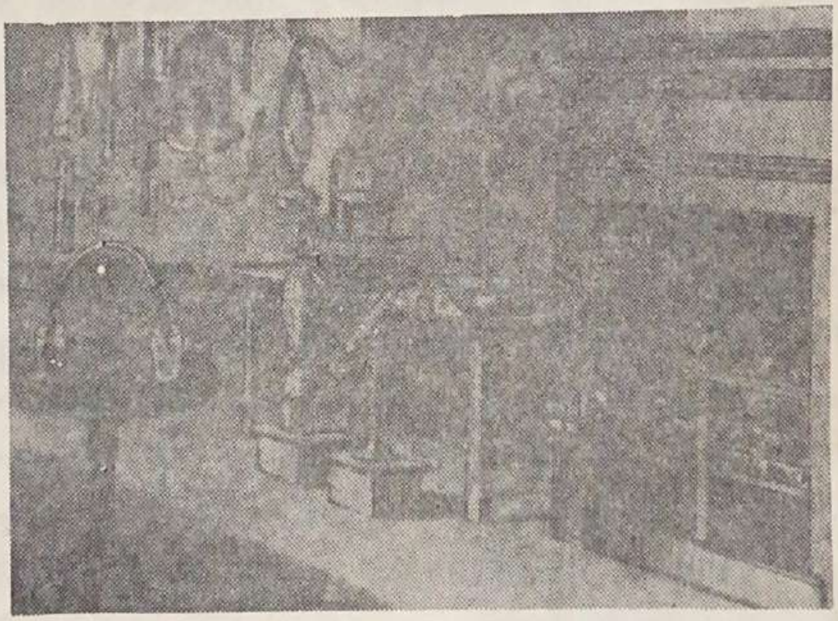

[জোসেফ প্রিস্টলীর নিজ পরীক্ষাগার]

কিন্তু, বার্মিংহামে পদার্পণের পর থেকে জোসেফ প্রিস্টলীর পূর্ব সুনামে ভাঁটা পড়তে লাগলো। এই সময় তিনি ধর্ম বিষয়ে নিজ মতামত ব্যক্ত করে কতকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সব প্রবন্ধই তার সুনাম নষ্টের মূল হয়ে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে এসবের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠলো। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যা অগণিত হলো। কিন্তু, এদের বিরোধিতা উপেক্ষা করে জোসেফ প্রিস্টলী নির্ভীক চিত্তে ফরাসী বিপ্লবের প্রতি তাঁর সমর্থনের কথা ঘোষণা করলেন। এতে তাঁর শত্রুদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গলো—তাদের ক্ষোভের মাত্রা চরমে উঠলো। তারা একদিন প্রিস্টলীর আবাসস্থল আক্রমণ করে বসলো—জ্বালিয়ে দিল তার ঘর-বাড়ী, কাগজ-পত্র, বই-খাতা সবকিছুই তারা তছনছ করলো। এই ঘটনার সময় প্রিস্টলী বাড়ীতে ছিলেন না। আড়াল থেকে এ খবর শুনতে পেয়ে তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে প্রাণভয়ে লণ্ডনে পালিয়ে এলেন।

প্রিস্টলীর প্রতি এরূপ অন্যায় আচরণের কথা শুনে অনেকেই দুঃখিত হলেন। সমবেদনাও জানালেন কেউ কেউ। কিন্তু মনে মনে কেউই তাঁকে দোষারোপ করতে ছাড়লেন না। ক্ষুব্ধ জনতার ভয়ে বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে এড়িয়ে চলতেন; এমন কি রয়াল সোসাইটির সভা-সমিতিতেও তার আমন্ত্রণ স্থগিত রইলো। তাঁর এক পুত্র চাকুরীর প্রত্যাশায় লণ্ডনের প্রায় প্রত্যেক ঘরে ঘরে ধর্ণা দিল, কিন্তু কেউই তাকে চাকুরী দিতে রাজী হলো না। অবশেষে, পরিস্থিতি উপলব্ধি করে ছেলেটি স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আমেরিকায় চলে যায়। এর কিছুদিন পর প্রিস্টলীও লণ্ডন ছাড়তে বাধ্য হলেন। সমাজচ্যুত হয়ে বসবাস করতে করতে তাঁর জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো; তাই তিনিও পাড়ি জমালেন পেন্‌সেল্‌ভেনিয়ার পথে।

পেন্‌সেল্‌ভেনিয়ায় পদার্পণের সাথে সাথেই বৈজ্ঞানিক জর্জ ওয়াশিংটন তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর প্রতি সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ তাঁকে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ প্রদান করা হয় এবং পরে

তাঁকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়; কিন্তু তিনি তা' গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কেননা, তখনও তাঁর মন থেকে বার্মিংহামের সেই বিষাদময় দিনগুলোর স্মৃতি মুছে যায়নি। তাই তিনি চুপচাপ নিরিবিলি জীবন-যাপন করতে মনস্থির করেছিলেন।

এখানে বসবাসের অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর প্রিয় পুত্র ও প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। পর পর এতো বড় আঘাত তিনি কিছুতেই সহজ মনে গ্রহণ করতে পারলেন না। শীঘ্রই তিনি ভগ্ন হৃদয় হয়ে পড়লেন। স্বাস্থ্য তাঁর ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে লাগলো। অবশেষে, ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। পেন্‌সেল্‌ভেনিয়ার হান্না নদীর তীরে এখনও তাঁর সমাধি মন্দির বিরাজ করছে।

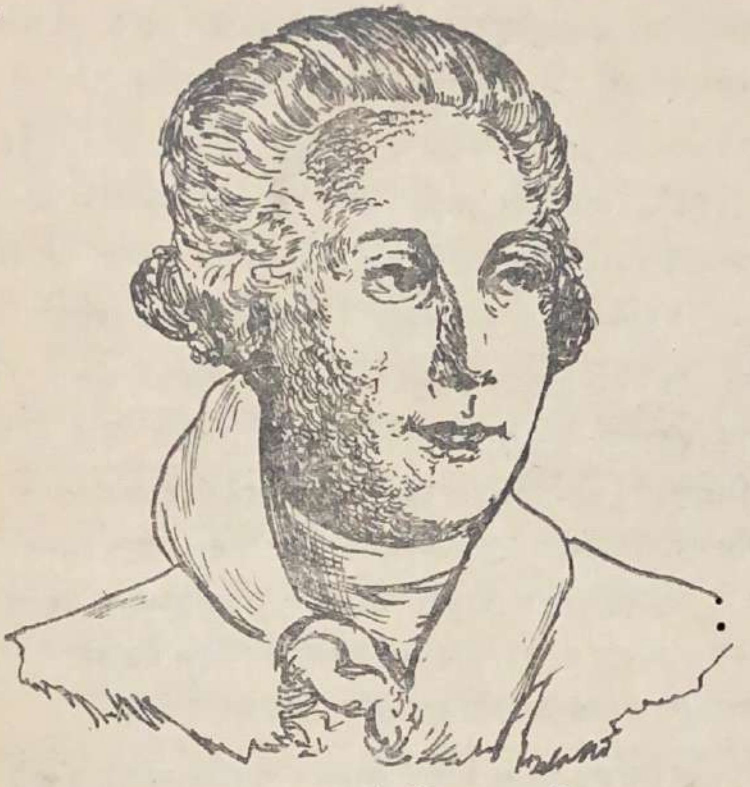

এণ্টনী লরেণ্ট ল্যাভয়শিয়ে

আজ থেকে প্রায় চৌদ্দ শ' বছর আগেকার কথা। এই সময় মিসর দেশে একদল বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটেছিল। এদের গবেষণার বিষয়বস্তু আলকেমী নামে পরিচিত। লোহা ও অন্যান্য ধাতু থেকে কি করে সোনা তৈরী করা যায়, তাই ছিল তাদের গবেষণার বিষয়। সে সময় তাদের সে প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করেনি। কিন্তু, তা' থেকেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা সম্পূর্ণ নতুন শাখার প্রবর্তন হয়েছিল; স্থাপিত হয়েছিল আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের ভিত্তি প্রস্তর। তারা রসায়ন-বিদ্যা সম্পর্কে অনেকগুলো মতবাদ প্রচার করেছিলেন; এর মধ্যে 'ফ্লোজিসটন' মতবাদটিই প্রধান। এতে তারা বললেন যে, দাহ্য বস্তু মাত্রই 'ফ্লোজিসটন' নামক এক প্রকার দ্রব্য দিয়ে প্রস্তুত। তাপ প্রয়োগের ফলে এটি উড়ে যায়—থাকে শুধু ভস্ম। এই ভস্মের সাথে 'ফ্লোজিসটন' পুনরায় মিশিয়ে দিতে পারলে আদি দ্রব্যটি

অনায়াসেই ফিরে পাওয়া যায়। আলকেমীবিদদের মৃত্যুর বহু বছর পরেও সবাই এই মতবাদটি মেনে চলতেন। এমন কি, প্রিস্টলীর ন্যায় এতোবড় বিজ্ঞানীও এর বিরোধিতা করেননি। তিনি ছিলেন এর গোঁড়া সমর্থক। অন্যান্য কেউই এর অসাড়তা সম্বন্ধে কখনও কোন প্রশ্ন উথাপন করেননি।

প্রিস্টলীর সম-সাময়িক কালে অপর একজন বৈজ্ঞানিক এণ্টনী লরেণ্ট ল্যাভয়শিয়ে সর্বপ্রথম আলকেমীবিদ্‌দের 'ফ্লোজিসটন' মতবাদের প্রতিবাদ করলেন। তিনি বললেন, তাদের প্রচারিত মতবাদটি ভুল। প্রিস্টলীর আবিষ্কার মূল্যবান হলেও আলকেমীবিদদের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল গোঁড়ামিপ্রসূত। কেননা, বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়শিয়ে তাঁর অনেকগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল থেকে 'ফ্লোজিসটনের' অসাড়তা সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত হয়েছিলেন। তিনিই প্রথম ঘোষণা করলেন যে বাতাসকে কখনও ছাই-এ রূপান্তরিত করা যায় না বা কোন দ্রব্যই কখনও নিঃশেষিত হয় না। দ্রব্যসমূহ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে থাকে মাত্র।

১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট তারিখে প্যারিস নগরীতে এণ্টনী লরেণ্ট ল্যাভয়শিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্যারিসের একজন নামকরা সম্ভ্রান্ত ও ধনী লোক ছিলেন। ছোট থাকতেই ল্যাভয়শিয়ের মাতৃ বিয়োগ ঘটেছিল। তিনি তাঁর পিতার স্নেহে ও একজন খালার সাহচর্যে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। ল্যাভয়শিয়েকে একজন পাকা আইনজীবী হিসেবে গড়ে তোলার ইচ্ছা ছিল তাঁর পিতার। তাই পিতার সে ইচ্ছা পূরণের জন্য ল্যাভয়শিয়েও আইন-বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা শেষ অবধি পূরণ হয়নি। কেননা, আইন ব্যবসায় শুরু করার অনুমতি পেয়েও ল্যাভয়শিয়ে তা' করেননি।

এণ্টনী ল্যাভয়শিয়ে ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। পূর্ব থেকেই বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি তাঁর একটা প্রাণের টান ছিল। তাই তিনি আইন অধ্যয়ন শেষ করে মাজারিন কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হলেন। এখানে তিনি জ্যোতিষ-বিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা ও ভূতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষালাভ

করেন।. ল্যাভয়শিয়ের শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সে যুগের নাম-করা বৈজ্ঞানিক। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি তাঁদের বক্তৃতা থেকে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। তাঁরা প্রায়ই তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা করতেন।

ল্যাভয়শিয়ের বয়স যখন মাত্র পঁচিশ বছর তখনই তাঁর প্রতিভার কিছু কিছু পরিচয় মিললো। তিনি ফ্রান্সের একখানা মানচিত্র প্রস্তুতের কাজে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে সবার কাছ থেকে প্রভূত প্রশংসা পেলেন। এই সময় তিনি প্যারিসী প্লাস্টার নিয়েও নানান্ রকমের গবেষণা করলেন। তখন, প্যারিস শহরের রাস্তা-ঘাটে আলোর সুবন্দোবস্তের জন্য একদিন একটি নক্সা প্রস্তুতের প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়। তিনি এই প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণ করলেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করে একটি স্বর্ণপদক লাভ করলেন। এই প্রতিযোগিতার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর পরই তাঁকে প্যারিসের বিজ্ঞান একাডেমির সদস্য পদে নির্বাচিত করা হয়।

পূর্ব থেকেই ল্যাভয়শিয়ে একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে, আর্থিক স্বচ্ছ-লতা ব্যতিরেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা বেশ কষ্টসাধ্য। কেননা, টাকা-পয়সার চিন্তা-ভাবনা নিয়ে গবেষণায় নিমগ্ন থাকা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি এই দিকে লক্ষ্য রেখে একটি বেসর-কারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হিসেবে যোগদান করেন। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম 'ফার্মারস জেনারেল'।

আঠাশ বছর বয়সে ল্যাভয়শিয়ে বিবাহ করেন। তাঁর পত্নীর নাম মেরী। মেরী সবসময়ই গবেষণা কার্যে ল্যাভয়শিয়েকে সাহায্য করতেন। ল্যাভয়শিয়ে ইংরাজী ভাষা :জানতেন না। কিন্তু মাঝে মাঝে গবেষণায় সুবিধার জন্য তাঁকে অনেকগুলি ইংরাজী পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিতে হতো। মেরী এসব ব্যাপারে ছিলেন তাঁর একমাত্র সাহায্যকারী বন্ধু। তিনি এই সব বই-পত্রের প্রয়োজনীয় অংশসমূহ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করতেন। একমাত্র মেরীর সক্রিয় সহযোগিতায় তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই দেশ-বিদেশের বড় বড় বিজ্ঞানীদের সভা বসতো।

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়শিয়ে 'ধাতুর দহন' বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। একদিন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, কোন কোন ধাতু বাতাসে পুড়লে এদের ওজন বেড়ে যায়। এই ওজন বাড়ার বিষয় নিয়ে তিনি অনেক চিন্তা-ভাবনা করলেন। তারপর, তিনি আবিষ্কার করলেন যে, ধাতুর এই বাড়তি ওজন শোষিত বায়ুর ওজনের সমান। তিনি প্রশ্ন করলেন, তা'হলে কি বায়ুর কোন একটি নির্দিষ্ট উপাদানের সাথে ধাতুর রাসায়নিক সংযোগ ঘটছে? তিনি বৈজ্ঞানিক প্রিস্টলীর আবিষ্কৃত গ্যাসটি নিয়ে এই পর্যায়ে পরীক্ষাকার্য চালালেন। তারপর, সত্যি সত্যি তিনি একদিন প্রমাণ করলেন যে, ধাতুসমূহ আগুনে পুড়লে প্রিস্টলীর আবিষ্কৃত গ্যাসটির সাথে সংযোজিত হয়ে এক প্রকার অম্লজের সৃষ্টি করে। তিনি এই গ্যাসের 'অক্সিজেন' নামকরণ করেছিলেন।

ল্যাভয়শিয়ে এই নিয়ে যে পরীক্ষাকার্যটি চলিয়েছিলেন তা' খুবই সহজ। তিনি প্রথমতঃ একটা মুখবন্ধ কাঁচের পাত্রে ওজন করা কিছু পরিমাণ টিনের গুঁড়া নেন। তারপর এই পাত্রটিতে উত্তাপ দিতে শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর তিনি দেখতে পেলেন যে, টিনের গুঁড়ার অংশবিশেষ ধূসর বরণ বর্ণ করেছে; তখন তিনি উত্তাপ দেওয়া বন্ধ করলেন এবং পাত্রটি আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করলেন। এরপর, এক সময় পাত্রটির মুখ খুললেন এবং লক্ষ্য করলেন যে, এর মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ বাতাস প্রবেশ করেছে। পরে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, পাত্রটির মুখ খুলার সাথে সাথে এতে যে পরিমাণ বাতাস প্রবেশ করেছে তা' ওই টিনের গুঁড়ার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ওজনের সমান। এ থেকে তিনি 'দহন মতবাদ' নামে একটি নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন।

এরপর, ল্যাভয়শিয়ে পানির বিশ্লেষণ নিয়ে অপর একটা পরীক্ষাকার্য চালালেন। তিনি পূর্ব থেকেই জানতেন যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুটি গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগের ফলেই পানির সৃষ্টি হয়। এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি একটা বন্দুকের নলের ন্যায় চোঙায় কিছু

পরিমাণ লোহার গুঁড়া রাখলেন এবং উত্তাপের সাহায্যে তা' লাল করলেন। তারপর, এই উত্তপ্ত লোহার গুঁড়ার উপর দিয়ে বাষ্প প্রবাহিত করলেন। নলটির অপর মুখে তিনি শুধুমাত্র হাইড্রোজন গ্যাস বেরিয়ে আসতে দেখলেন। আর অক্সিজেন গ্যাস লোহার গুঁড়ার সাথে অম্লজ তৈরী:করে তা' নলের মধ্যেই রয়ে গেল।

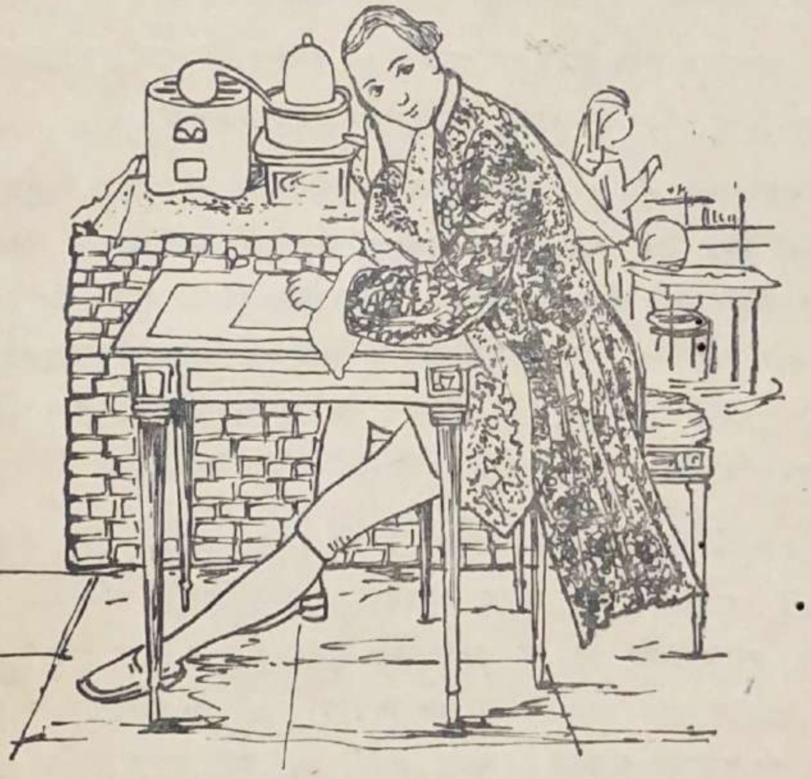

[ল্যাভয়শিয়ে তাঁর বিখ্যাত যন্ত্র নিয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের রাসায়নিক সংবোগ পরীক্ষা করছেন।]

এই পরীক্ষাটি বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়শিয়ের পূর্বের ধারণাকে আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করলো। তিনি বললেন, শতাব্দীর সেই পুরাতন 'ফ্লোজিসটন' মতবাদটি সম্পূর্ণই ভুল। 'পদার্থকে তাপ প্রয়োগ করলেই তা' থেকে 'ফ্লোজিসটন' নামে এক প্রকার দ্রব্য নির্গত হয়'—তা' কখনই হতে পারে না। "পদার্থের ক্ষয় নেই, এরা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায়

রূপান্তরিত হয় মাত্র'—ল্যাভয়শিয়ে সবাইকে এই মতবাদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালেন। অনেকেই তাঁর ডাকে সাড়া দিল।

কিন্তু, একদল রক্ষণশীল বৈজ্ঞানিক কিছুতেই তাঁর এ নতুন মতবাদটি স্বীকার করতে রাজী হলেন না। তাঁরা এর বিরোধিতা করতে লাগলেন। বেশ কিছুদিন ধরে তাঁদের এ বিরোধিতা অব্যাহত রইলো। এতদিনের পুরাতন 'ফ্লোজিসটন' মতবাদটিকে তাঁরা সহজেই অস্বীকার করতে পারলেন না। ফলে, ল্যাভয়শিয়ের আবিষ্কৃত নতুন মতবাদটির প্রগতি সাময়িকভাবে ব্যাহত হলো ; বিলম্বিত হলো আরও নতুন নতুন আবিষ্কার।

প্রতিবাদের ঝড় যখন শান্ত হলো, প্রায় সবাই যখন তাঁর নতুন মতবাদটি মেনে নিল, তখন তিনি পুনরায় গবেষণায় মনোনিবেশ করলেন। নতুন উদ্যমে তাঁর গবেষণা চললো। এই সময় তিনি প্যারিসের আরও কয়েকজন নামকরা রসায়নবিদসহ পদার্থসমূহের নতুন নামকরণের জন্য একটা কমিটি গঠন করেন। তাঁদের দেওয়া পদার্থের নামের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হলেও এখনও সবাই তা' মেনে চলে।

বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়শিয়ের নিজে নিজেই হঠাৎ একদিন প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে আমরা যে প্রতিনিয়তই অক্সিজেন গ্রহণ করছি, মানব দেহে এর কি প্রতিক্রিয়া রয়েছে?' এ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে গবেষণা চালালেন। তারপর বললেন, এই অক্সিজেনের সাহায্যে আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে অহরহ একটা দহন কার্য চলছে। এর ফলেই দেহে তাপের সৃষ্টি হয় এবং 'কার্বন ডাই অক্সাইড' নামক এক প্রকার গ্যাস উৎপাদিত হয়ে নিঃশ্বাসের সাথে তা' বেরিয়ে আসে।

শরীরে তাপ সৃষ্টির এই সূত্রটি অনুসরণ করে তিনি ও লা প্লেস নামক অপর একজন বৈজ্ঞানিক মিলে একটা নতুন সূত্র আবিষ্কার করলেন। তাঁরা বললেন, "মূল উপাদানের সংমিশ্রণে কোন একটি নতুন দ্রব্য সৃষ্টির সময় যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় ; তা' ওই দ্রব্যটি ভেঙ্গে আদি উপাদান প্রস্তুতের সময় শোষিত তাপের অবিকল সমান।" এই সূত্রটি পরীক্ষার

কালে ল্যাভয়শিয়ে একদিন একটা নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রটি "কালোরিমিটার" নামে আজও জগৎ খ্যাত।

বৈজ্ঞানিক হিসেবে ল্যাভয়শিয়ের নাম বহু পূর্বেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও কর্মক্ষমতার কথা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করতো। প্রায়ই তাঁকে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ছোট-বড় নানাবিধ সমস্যার সমাধান করতে হতো। তা'ছাড়া, সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহে তাঁর সহযোগিতা ছিল অনেকটা রুটিন মাফিক। এতে তাঁর মৌলিক গবেষণায় ব্যাঘাত ঘটতো বটে; তবে তিনি তা' নীরবে সহ্য করতেন।

একবার ফ্রান্সের একটা সরকারী গোলা-বারুদের কারখানায় সোরার ভীষণ অভাব দেখা দিল। সবাই পড়লেন মুস্কিলে! সোরার অভাবে কারখানাটি প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম; কেননা, সোরা হচ্ছে বারুদ প্রস্তুতের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সাথে সাথেই বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়শিয়ের ডাক পড়লো। তিনি অতি সহজেই এর সমাধানের পথ খুঁজে বের করলেন। তিনি দেখলেন যে, সোরা তৈরীর ভার রয়েছে একটা অকর্মণ্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর। তিনি সোরা তৈরীর জন্য একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান গঠনের উপদেশ দিলেন এবং তদানুযায়ী সাথে সাথেই তা' করা হলো। ল্যাভয়শিয়ের উপর এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার অর্পিত হলো। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনাধীনে মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সের বারুদ প্রস্তুতের পরিমাণ প্রতি বছর ৭১৪ টন থেকে ১,৬৮৬ টনে উন্নীত হলো।

১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দ। এই সময় ল্যাভয়শিয়ে রসায়ন-বিদ্যা নিয়ে লেখা একখানা বই প্রকাশ করেন। এই বইখানা বিজ্ঞানের ইতিহাসে সম্পূর্ণ এক নতুন বিপ্লবের সূত্রপাত করেছিল। এর পূর্বে এতো সুন্দর ও রসায়ন-বিদ্যা নিয়ে এমন ধারাবাহিকভাবে লেখা বই পূর্বে আর কখনও প্রকাশিত হয়নি। এই বছরই অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। এটি বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লব। প্রথম বিপ্লবটি এনেছিল রসায়ন-শাস্ত্রে এক আমূল পরিবর্তন আর দ্বিতীয়টি সমাজকে নতুনভাবে গড়ার প্রতিশ্রুতি বহন করেছিল। ইতিহাসে এমন দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার একত্র সমন্বয় খুব কমই দেখা যায়।

বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়শিয়ে ছিলেন আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের প্রকৃত জনক। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে তিনি এতো বড় বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও এক শোকাবহ ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের শেষ পরিণতি ঘটেছিল। প্রথম জীবনে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুবিধার জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটির অংশীদার হয়েছিলেন; সেটিই তাঁর জীবনে মৃত্যুর পরওয়ানা ডেকে আনলো। কেননা, ফরাসী বিপ্লবের নায়কগণ পূর্ব থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটিকে সুনজরে দেখতেন না। তাঁদের ধারণা ছিল যে এটি সাধারণ লোকের কাছ থেকে অসৎ উপায়ে টাকা-পয়সা রোজগার করে ফেঁপে ফুলে উঠেছে। তাই ক্ষমতা দখলের সাথে সাথেই তাঁরা এ প্রতিষ্ঠানটি বন্ধের নির্দেশ দিলেন এবং এর সদস্যদের প্রতি রাষ্ট্র বিরোধিতার অভিযোগ আনলেন। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৮ই মে তারিখে জল্লাদের সাহায্যে তাঁদের শিরচ্ছেদ করা হলো। সেই সঙ্গে জগৎ একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের মহান অবদান থেকে বঞ্চিত হলো।

ল্যাভয়শিয়ের ন্যায় এতো বড় বৈজ্ঞানিকের মৃত্যুতে বিশ্ববাসী দুঃখিত হলো। তাঁর এরূপ মৃত্যুর জন্য জোসেফ লুইস লাগরেঞ্জ নামক একজন বিখ্যাত গাণিতিক বলেছিলেন, "ল্যাভয়শিয়ের শিরচ্ছেদ করতে মাত্র কয়েক মুহূর্তের প্রয়োজন হয়েছিল; কিন্তু এরূপ অপর একজন বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করতে সম্ভবতঃ এক শতাব্দীরও অধিক সময় লাগবে।"

ল্যাভয়শিয়ে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের ন্যায় চমকপ্রদ বেশী কিছু আবিষ্কার করেননি; তথাপি তিনি যুগ যুগ ধরে মানুষের স্মৃতিপটে অমর হয়ে থাকবেন। কেননা, তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর পূর্ববর্তী আবিষ্কারকদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আবিষ্কারকে সাধারণ সূত্রে লিপিবদ্ধ করার নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। তিনি শতাব্দীর সেই পুরাতন 'ফ্লোজিসটন' মতবাদকে খণ্ডন করে সম্পূর্ণ এক নতুন মতবাদের প্রচলন করেছেন। এই মতবাদের উপর ভিত্তি করেই আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। তাই বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়শিয়েকে আমরা অনায়াসেই নতুন পথের দিশারী—প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিপ্লবী নায়ক ও আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের জনক বলে অভিহিত করতে পারি।

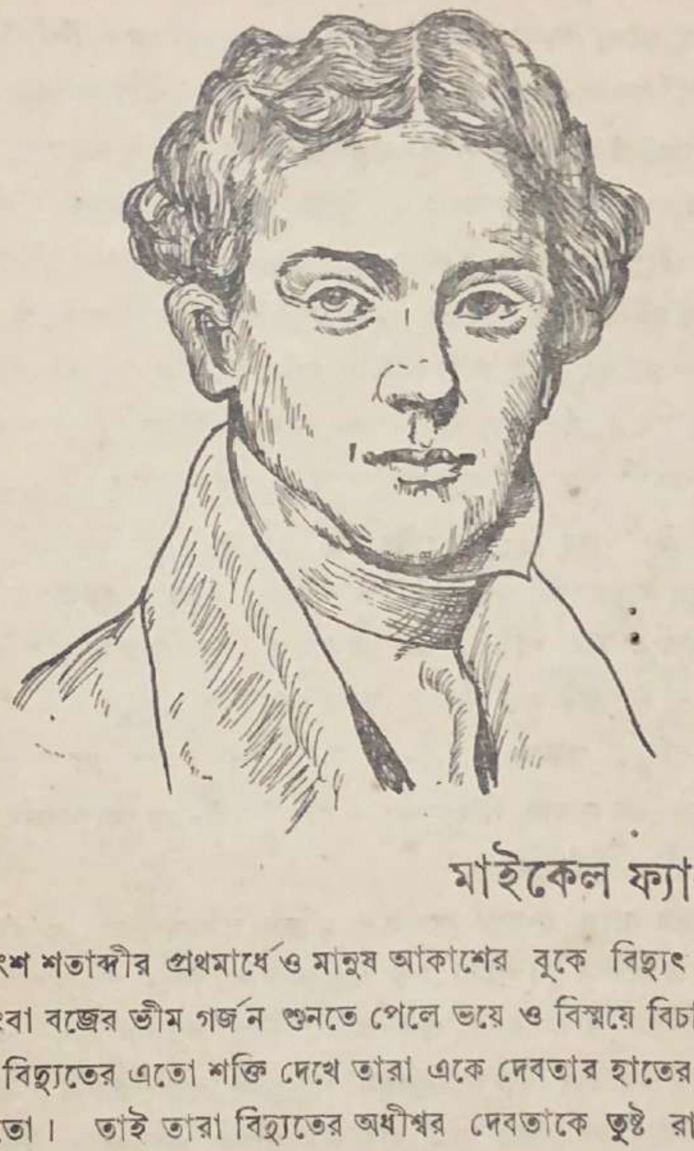

মাইকেল ফ্যারাডে

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও মানুষ আকাশের বুকে বিদ্যুৎ চম্‌কাতে দেখলে কিংবা বজ্রের ভীম গর্জন শুনতে পেলে ভয়ে ও বিস্ময়ে বিচলিত হয়ে পড়তো। বিদ্যুতের এতো শক্তি দেখে তারা একে দেবতার হাতের অস্ত্ররূপে কল্পনা করতো। তাই তারা বিদ্যুতের অধীশ্বর দেবতাকে তুষ্ট রাখার জন্য নানাবিধ পূজা-অর্চনা ও অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করতো। কিন্তু যেদিন আকাশের এই বিদ্যুৎ দেখে মানুষ নিজেই বিদ্যুৎ তৈরীর কাজে হাত দিল, তখন থেকেই পৃথিবীতে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হলো; মানুষ বিদ্যুৎকে নিজের কাজে খাটাবার জন্য নানারূপ পরীক্ষা চালালো। ফলে, একদিন মহাশক্তিধর এই বিদ্যুৎ-ই আজ্ঞাবাহী পরিচারিকার ন্যায় মানুষের বিভিন্ন কাজ করে চললো।

মাইকেল ফ্যারাডে নামক একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম বিদ্যুৎকে মানুষের প্রয়োজনে খাটানোর কাজে ব্রতী হন। তিনিই বর্তমানের এই বৈদ্যুতিক যুগের প্রবর্তক। একদিন বৃটিশ আইনসভায় মাইকেল ফ্যারাডে যখন তাঁর বিদ্যুৎ-তত্ত্বের কথা প্রথম ঘোষণা করেন তখন তদানীন্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ গ্লাডস্টোন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার এ আবিষ্কার দিয়ে আমাদের কি লাভ? এরূপ ছেলেমানুষী জিনিস নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করছেন কেন?' এর উত্তরে ফ্যারাডে বলেছিলেন, 'হে মন্ত্রী মহোদয়! সেদিন আর বেশী দূরে নয় যখন আপনি আমার এই আবিষ্কৃত বস্তুর উপর কর ধার্যের জন্য এগিয়ে আসবেন!' আজকের দিনে ফ্যারাডের সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১৭৯১ খ্রীস্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডনের নিকটবর্তী নিউইংটন নামক স্থানে ফ্যারাডের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন একজন দরিদ্র কর্মকার। ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে বেশী লেখাপড়া শেখানোর মত আর্থিক সঙ্গতি তাঁর ছিল না। তাই অল্প বয়সেই ফ্যারাডেকে স্কুল ছেড়ে অর্থ উপার্জনের তাগিদে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। মাত্র তের বৎসর বয়সে তিনি জর্জ রিবো নামক এক সংবাদ পরিবেশক ও বই বাঁধাই-এর দোকানের মালিকের অধীনে একটা চাকুরী নেন।

আজকের ন্যায় সে-যুগে কাগজ বা মুদ্রিত পত্র-পত্রিকা কোনটাই সুলভ ছিল না। এগুলোর দুর্মূল্যতা হেতু অনেকেই তা' কিনে পড়তে অক্ষম ছিল। তখনকার দিনে তাই এসব পত্র-পত্রিকা কিছু সময়ের জন্য ভাড়া করে পড়ার বিধি প্রচলিত ছিল। একজন পাঠকের পড়া সমাপ্ত হলে পত্রিকা মালিকের নির্ধারিত লোক অন্য পাঠকের কাছে তা' পৌছে দিত। এতে অল্প খরচে অনেকেই তাদের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণ করতে সক্ষম হতো। জর্জ রিবোর অধীনে সংবাদপত্র বিতরণ ও তা' সংগ্রহের কাজই করতে হতো মাইকেল ফ্যারাডেকে।

এই কাজে কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়ায় জর্জ রিবো তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে বই বাঁধাইয়ের দোকানে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করলেন। এই সময়

থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ সৃষ্টি হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে তা' বৃদ্ধি পেল। বিজ্ঞান নিয়ে লেখা যে-সব বই তাঁদের দোকানে বাঁধাইয়ের জন্য আসতো, ফ্যারাডে তার প্রায়গুলোই পড়ে ফেলতেন। যে-সব বইয়ের বিষয়বস্তু তাঁর বুঝতে কষ্ট হতো, তিনি পরে তা' বইয়ের মালিকের কাছ থেকে সুন্দরভাবে বুঝে নিতেন। এমনিভাবে অনেকের সাথেই তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। মাইকেল ফ্যারাডে 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা'র বিদ্যুৎ বিষয়ক অধ্যায়টি এবং মার্সেট রচিত "রসায়ন বিষয়ক কথোপকথন" পড়তে আনন্দ পেতেন সবচেয়ে বেশী।

এই সময় মিঃ ড্যান্স নামক একজন লোকের সাথে তাঁর গভীর হৃদ্যতা গড়ে উঠে। তিনি মাইকেল ফ্যারাডের জ্ঞানম্বেষণের প্রগাঢ় বাসনা দেখে মুগ্ধ হলেন। একদিন তিনি ফ্যারাডেকে স্যার হামফ্রে ডেভীর বক্তৃতা শুনার জন্য চারখানা টিকিট উপহার দেন। স্যার হামফ্রে ডেভী বক্তৃতা করবেন রয়াল ইনষ্টিটিউটে। তিনি ছিলেন সে সময়ের একজন সেরা রসায়নবিদ। তাঁর আবিষ্কৃত "ডেভীর বাতি" গোটা জগতে একদিন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কয়লার খনিসমূহে অন্ধকার নিরসনের জন্য এটি ব্যবহৃত হতো।

স্যার ডেভী মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে বিজ্ঞানের প্রগতির উপর বক্তৃতা দিতেন। মাইকেল ফ্যারাডে ডেভীর বক্তৃতা শুনার টিকিট পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। এমন সুযোগ কি কখনও ছাড়া যায়? নির্দিষ্ট দিনে বৈজ্ঞানিক ডেভীর বক্তৃতা শুনার জন্য তিনি রয়াল ইনষ্টিটিউটে হাজির হলেন। গভীর মনযোগের সাথে শুনলেন তাঁর প্রত্যেকটি কথা। বাড়ীতে ফিরে এর উপর ৩৮৬ পৃষ্ঠার একটা সুন্দর নোট প্রস্তুত করলেন। এবং প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে নিজেই যন্ত্রপাতির ছবিও আঁকলেন। তারপর, একদিন তিনি বহু আশায় স্যার ডেভীর নিকট এই নোটগুলো পাঠিয়ে দিলেন এবং সাথে লিখলেন ছোট্ট একখানা চিঠি। স্যার ডেভীর অধীনে যে-কোন একটা চাকুরীর জন্য আবেদন জানালেন তাতে।

স্যার ডেভী সহানুভূতির সাথে ফ্যারাডের লেখা চিঠি ও তাঁর নোটগুলো পড়লেন ; মনে মনে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে তাঁর প্রধান কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত করলেন । কিন্তু এর মাস কয়েক পরে তিনি তাঁকে বরখাস্ত করলেন এবং বই বাঁধাইয়ের দোকানে ফিরে যাওয়ার জন্য উপদেশ দিলেন । বেশী দিন যেতে না যেতেই তিনি পুনরায় ফ্যারাডেকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে রয়াল ইনস্টিটিউটে পরীক্ষাগারের সরকারী হিসেবে নিযুক্ত করলেন । এতে ফ্যারাডে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন । এটাকেই তিনি প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত স্থান বলে গণ্য করলেন । বৈজ্ঞানিক ডেভীর সহকারী হিসেবে মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করতে লাগলেন তিনি । তাঁর এরূপ একাগ্রতা দেখে ডেভী মুগ্ধ হলেন ।

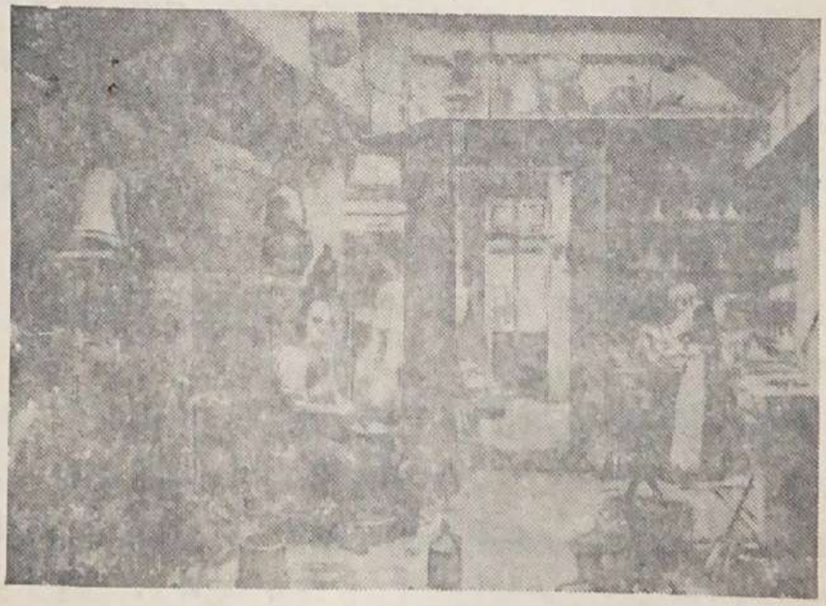

[মাইকেল বৈজ্ঞানিক ডেভীর সহকারী হিসাবে কাজ করছেন]

রয়াল ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক ডেভী ও ফ্যারাডে উভয়ে মিলে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন । এই দ্রব্যটির নাম ‘ক্লোরিন’ । ‘নাইট্রোজেন’ ও ‘ক্লোরিনের’ রাসায়নিক সংমিশ্রণে তাঁরা একটি নতুন বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত করলেন । এই দ্রব্যটি প্রস্তুতের সময় তাঁরা উভয়েই আহত হয়েছিলেন অনেকবার । তবুও তাঁরা নিজেদের সঙ্কল্পে

অটুট ছিলেন। গবেষণার আনন্দে হাসিমুখে মৃত্যুর ঝুঁকি নিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি তাঁরা।

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে স্যার হামফ্রে ডেভী ও তাঁর পত্নী মাইকেল ফ্যারাডেকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। নানান্ দেশ ঘুরলেন তাঁরা। যেখানে উপস্থিত হলেন সেখানেই পেলেন বিপুল সম্বর্ধনা। কেননা, বৈজ্ঞানিক হামফ্রে ডেভীর নাম তখনকার দিনে কারও অজানা ছিল না। তাঁর এ বিপুল সম্বর্ধনা দেখে ফ্যারাডের মন আনন্দে নেচে উঠলো। সুদীর্ঘ দু'বছর ধরে তাঁরা ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করলেন।

ইউরোপে ভ্রমণকালে ফ্যারাডে অনেকগুলো বিজ্ঞানকেন্দ্র পরিদর্শন করেছিলেন। ইটালীর ফ্লোরেন্স শহরে তিনি মহাবিজ্ঞানী গ্যালিলিওর নির্মিত দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি পরিদর্শন করেন এবং দেশে ফিরে তিনি এর উৎকর্ষ সাধনে মনযোগী হন। এই সময় তিনি দু'জন নামকরা বৈজ্ঞানিক ভল্টা ও এমপিয়ারের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তড়িৎ-বিজ্ঞানে এদের প্রভূত অবদান রয়েছে। এঁদের সাথে আলাপ-আলোচনার পর থেকে ফ্যারাডের মনেও তড়িৎ-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করার বাসনা দানা বাঁধতে থাকে।

দেশে ফিরে মাইকেল ফ্যারাডে প্রথমতঃ রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত রইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই এতে তাঁর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটতে লাগলো। তিনি নানাবিধ নতুন নতুন রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কার করলেন। 'ক্লোরিন' নামক বায়বীয় পদার্থকে তরলিতকরণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। অন্যান্য আরও কয়েক প্রকার বায়বীয় পদার্থকে এই নিয়মে তরলিত করা সম্ভব বলে তিনি মত প্রকাশ করলেন। মাইকেল ফ্যারাডে লোহা থেকে মরিচামুক্ত এক প্রকার শঙ্কর ধাতু, নতুন ধরনের চশমার কাঁচ এবং বেনজিন নামক দ্রব্যসমূহ আবিষ্কার করলেন। ব্যবহারিক বিজ্ঞানে তাঁর এসব আবিষ্কারের মূল্য তুলনাহীন। ফ্যারাডের আবিষ্কৃত

বেনজিন দ্রব্যটি আধুনিক রসায়ন শিল্পে এনেছে নতুন বিপ্লব। তাঁর স্বহস্তে প্রস্তুত কিছু পরিমাণ বেনজিনের নমুনা আজও বৃটিশ যাদুঘরে রক্ষিত রয়েছে।

এরপর, মাইকেল ফ্যারাডে তড়িৎ বিষয়ে তাঁর কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ফলাফল ঘোষণা করলেন। তিনি তড়িৎ বিশ্লেষণে ও তার মূলনীতির কথা লিপিবদ্ধ করলেন। তড়িৎ বিশ্লেষণে তিনি বললেন; "পানি কিংবা পানিতে দ্রবীভূত কোন রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত করা হলে তা' দুই বা ততোধিক পরমাণুতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।" ফ্যারাডের আবিষ্কারের এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথেই চারিদিকে তুমুল সাড়া পড়ে গেল।

সংবাদপত্র পরিবেশনা ও বই বাঁধাইয়ের দোকানের শিক্ষানবীশ হিসেবে জীবন যার শুরু—কালে সেই হলো একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অমর অবদানের জন্য তাঁকে রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্বাচনের জন্য অনেকেই প্রস্তাব করলেন। কিন্তু এতে বাধা প্রদান করলেন স্যার হামফ্রে ডেভী। তবে, তাঁর সে বাধা শেষ পর্যন্ত টেকসই হয়নি। স্যার ডেভী ব্যতীত সবাই তাঁকে রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত করলেন। এই সময় ফ্যারাডের বয়স ছিল মাত্র বত্রিশ বছর। এর বছর দুই পর তিনি রয়াল ইনস্টিটিউটের পরিচালক নিযুক্ত হন।

১৮২০ খ্রীস্টাব্দ। এই সময় হান্স ক্রিশ্চিয়ান অরস্টেড নামক ডেনমার্কের একজন পদার্থবিদ তড়িৎ-বিজ্ঞানে একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের কথা বললেন। তিনিই প্রথম লক্ষ্য করলেন যে, যখন কোন তারের মধ্য দিয়ে অনবরত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে, তখন এর কাছে কোন কম্পাসের কাঁটা আনলে তা' কিছুটা দূরে সরে যায়। অরস্টেড এর কারণস্বরূপ বললেন যে, বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের চারদিকে চৌম্বক-ক্ষেত্র রয়েছে। অরস্টেডের এর আবিষ্কারের কথা শোনার সাথে সাথেই স্যার ডেভী ও মাইকেল ফ্যারাডে উভয়েই এর প্রতি অধিক আকৃষ্ট হন। তাঁরা ভাবলেন, অরস্টেডের এ আবিষ্কার কি কৃত্রিম গতি সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা সম্ভব?

১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে মাইকেল ফ্যারাডে এককভাবে গবেষণা চালিয়ে তাঁর একটি পরীক্ষার ফলাফল রয়াল সোসাইটির সদস্যদের কাছে প্রকাশ করলেন। এটি একটি ইতিহাস সৃষ্টিকারী আবিষ্কার। সোসাইটির সদস্যরা তাঁর এ আবিষ্কারে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মাইকেল ফ্যারাডে এতে বললেন, একটি ধাতব তারের কুণ্ডলীর অভ্যন্তরে যদি একটি চুম্বক দণ্ড সঞ্চালন করা যায়, তবে সেই তারের কুণ্ডলীর মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এটা 'আবেশ-জাত বিদ্যুৎ' নামে পরিচিত। আজকাল ডাইনামোর সাহায্যে আমরা যে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে থাকি তা ফ্যারাডের আবিষ্কৃত এই 'আবেশ জাত বিদ্যুৎ' ভিন্ন আর কিছুই নয়।

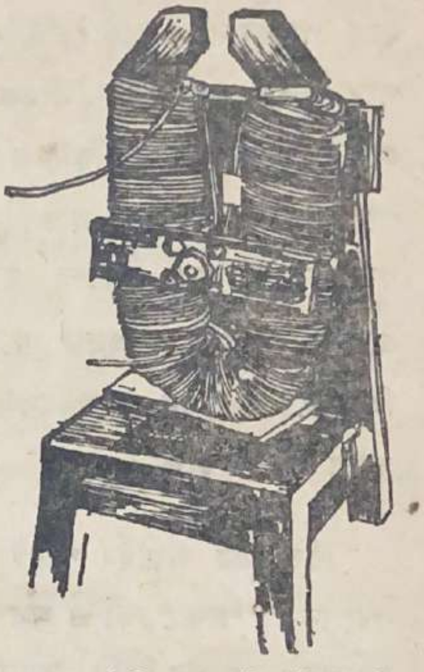

[ফ্যারাডের ইতিহাস সৃষ্টিকারী আবিষ্কার আবেশ-জাত বিদ্যুত]

মাইকেল ফ্যারাডেই বিশ্বে সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক ডাইনামো প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রটি ছিল নেহায়েতই সেকেলে। বর্তমান যুগে এর যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এই যন্ত্র নির্মাণে ফ্যারাডে প্রথমতঃ একটি জটিল চুম্বক নেন এবং তার দুই মেরুর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে একটা তামার গোল থালা স্থাপন করেন। তারপর, এই থালাটিকে চক্রাকারে ঘুরাতে থাকেন ঃ এই ঘূর্ণনের ফলে যন্ত্রটি থেকে 'আবেশ-জাত বিদ্যুৎ' মিললো। এটিই ফ্যারাডের নির্মিত বিশ্বের প্রথম ডাইনামো।

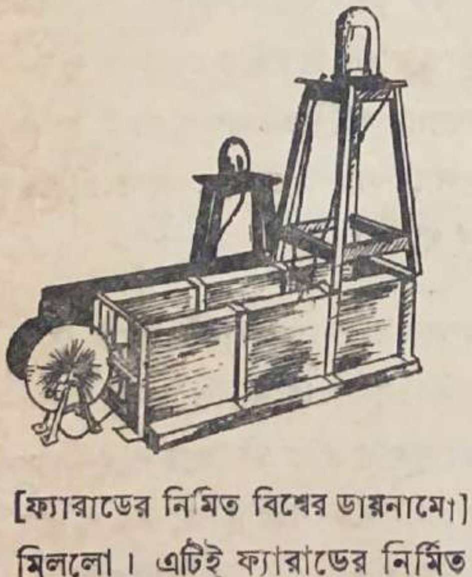

[ফ্যারাডের নির্মিত বিশ্বের ডায়নামো]

বৈজ্ঞানিক স্যার ডেভী কিন্তু বিদ্যুৎ সম্পর্কিত গবেষণায় সফলকাম হতে পারেননি। তাই তিনি ফ্যারাডের এ আবিষ্কারে ঈর্ষান্বিত হলেন। পরে, তিনি অলাস্টোন নামক অপর একজন বৈজ্ঞানিকের সাথে মিলিত হয়ে ফ্যারাডের এ আবিষ্কারের তীব্র সমালোচনা করলেন। তাঁরা ফ্যারাডের গবেষণার প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁরা মিথ্যা অভিযোগ করলেন, ফ্যারাডে তাঁদের গবেষণার ফলাফল চুরি করে নিজের নামে প্রকাশ করেছেন। এজন্য ফ্যারাডে কিছুদিন নীরব রইলেন। মিথ্যা বিপত্তিতে তাঁর মন ভেঙ্গে গেল ; মূল্যবান গবেষণার অগ্রগতি সাময়িক ভাবে ব্যাহত হলো।

কিন্তু এর অল্পদিন পরেই ফ্যারাডে পুনরায় গবেষণায় মনোনিবেশ করলেন। স্যার ডেভী ও অলাসটোনের মিথ্যা অভিযোগকে তিনি অবজ্ঞা করলেন। এরপর তিনি বৈদ্যুতিক চুম্বকত্বের কারণ খুঁজতে লাগলেন ; মনে মনে প্রশ্ন করলেন, কেন এমন হয়? এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি অঙ্কশাস্ত্র কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলেন। কেননা, ফ্যারাডে অঙ্কে পারদর্শী ছিলেন না। তাই তিনি বৈদ্যুতিক চুম্বকত্বের প্রাকৃতিক বিশ্লেষণ দান করলেন। তিনি বললেন, একটা চুম্বক দণ্ডের চারদিকে লোহার গুঁড়া ছড়িয়ে দিলে তা আপনা আপনি কতকগুলো সারিতে আবদ্ধ হয়। তিনি এর বিশ্লেষণ দিয়ে বললেন, চুম্বক দণ্ডের আশে-পাশে যে শূন্য স্থান রয়েছে তা সব সময়ই চুম্বকের বলরেখায় পরিপূর্ণ থাকে।

মাইকেল ফ্যারাডে এখানেই ক্ষান্ত হলেন না। অবিরাম গতিতে তাঁর গবেষণা এগিয়ে চললো। বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে তিনি জীবনপণ করলেন। আমাদের চারদিকে যে বিস্তর শূন্যস্থান পড়ে রয়েছে তাই নিয়ে তিনি নতুনভাবে গবেষণা শুরু করলেন। এর মধ্যে নানান্ ধরনের শক্তির সমাবেশ দেখতে পেলেন তিনি। তিনি বললেন, এই শূন্যস্থান চুম্বকীয়,

বৈদ্যুতিক, আলোকীয়, তাপজ ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে ভরা। শূন্যস্থান সম্বন্ধে এটিই তাঁর বিখ্যাত তত্ত্ব। পরবর্তীকালে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ডঃ আলবার্ট আইনস্টাইনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তোমরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে যে, আজকাল প্রায় প্রত্যেকটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাথে একটি কিংবা একাধিক বিদ্যুৎপ্রবাহ নিয়ন্ত্রক সংলগ্ন থাকে। এই নিয়ন্ত্রকের সাহায্যে অনায়াসেই বিদ্যুৎপ্রবাহের গতিবেগ হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি করা সম্ভব। এটি মাইকেল ফ্যারাডের আবিষ্কৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই সৃষ্ট। তিনিই সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ পরিমাপের যন্ত্রটিও আবিষ্কার করেন।

ফ্যারাডের মহান আবিষ্কারসমূহের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ তাঁকে সাদর আহ্বান জানালেন। শিল্প প্রসারের জন্য তারা তাঁকে মোটা বেতনে চাকুরীতে নিয়োজিত করতে চাইলেন। কিন্তু, ফ্যারাডে এতে রাজী হলেন না। অধিক টাকা উপার্জনের লিপ্সা তাঁর কোন দিনই ছিল না। সম্পদের প্রাচুর্যতাকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক হিসেবে আজীবন দারিদ্র্যতার মধ্যে কাটিয়েছেন তিনি; বিশ্ব-মানবতার সেবায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন।

আজ ঘরে বাইরে যে বিজলী বাতি জ্বলছে, অসুরের ন্যায় বড় বড় শিল্প কারখানা চলছে, টেলিফোনে সবাই কানে কানে কথা বলছে, দূর-দূরান্ত থেকে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে কথা ভেসে আসছে, রেডিওতে লোকে গান শুনছে, টেলিভিশনে বক্তার চেহারার সাথেও পরিচয় ঘটছে, এক্সরে ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের মাধ্যমে দুনিয়ার বুক থেকে রোগ-শোক বিদায় নিতে চলেছে, এসব কিছুর মূলে রয়েছে মাইকেল ফ্যারাডের অমর অবদান। তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই এগুলোর সৃষ্টি হয়েছে।

তড়িৎ-বিজ্ঞানের প্রায় সবক'টি মৌলিক মতবাদই ফ্যারাডের অবদান। তাঁর ন্যায় এতো বড় মহান আবিষ্কারকের সংখ্যা বিজ্ঞানের ইতিহাসে খুব কমই রয়েছে। সেই কারণেই আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁকে গ্যালিলিওর চেয়েও বড় বৈজ্ঞানিক হিসেবে মানতেন। বিংশ শতাব্দীর মানব সভ্যতা ফ্যারাডের কাছে চির ঋণী হয়ে থাকবে।

সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর কাল যাবৎ মাইকেল ফ্যারাডে রয়াল ইন্‌স্টিটিউটে নিঃস্বার্থভাবে গবেষণা কার্য পরিচালনা করেন। এই সময় তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে সর্বমোট ১৫৮টি মৌলিক গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর এ মহান অবদানের জন্য তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অসংখ্য উপহার, পদবী ও পদকে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই তাঁর আবিষ্কৃত বিষয়বস্তুর উপর স্থানে স্থানে বক্তৃতা দিতেন।

বিজ্ঞানের দুরূহ মৌলিক আবিষ্কার নিয়েই মাইকেল ফ্যারাডে তাঁর সারাটা জীবন কাটিয়ে দেননি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শিশুদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং শিশুদের উপযোগী সহজ ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করতেন। প্রতি বছর বড়দিনের ছুটিতে তাদের জন্য তিনি ধারাবাহিক বক্তৃতার আয়োজন করতেন। তিনি সুদীর্ঘ উনিশ বৎসর যাবৎ এরূপ বক্তৃতা দেওয়ার রীতি প্রচলিত রেখেছিলেন।

১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে মাইকেল ফ্যারাডে হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি এ অসুস্থতার হাত থেকে আর কোন দিনই সম্পূর্ণরূপে সেরে উঠতে সক্ষম হননি। শেষ বয়সে এই অসুস্থতা হেতু তাঁর স্মরণ শক্তি অনেকাংশেই লোপ পেয়েছিল। কিন্তু, তা' সত্ত্বেও তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার দুর্বার গতি কোনদিন রুদ্ধ হয়নি।

মাইকেল ফ্যারাডে ছিলেন অত্যন্ত সরল, সাদাসিদা ও অতি অমায়িক প্রকৃতির লোক। তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও লেখা-পড়ার মধ্যেই কাটিয়াছেন সারাটা জীবন। জ্ঞান পিপাসা নিবারণের জন্য তিনি অবসর

সময়ে কখনও বই ছাড়া থাকতেন না। এমন কি, এই মহান বৈজ্ঞানিক মৃত্যু কালেও তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ঘরের চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় একখানা বই পড়ছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ২৫ শে আগস্ট তারিখে তাঁর প্রাণবিয়োগ ঘটে।

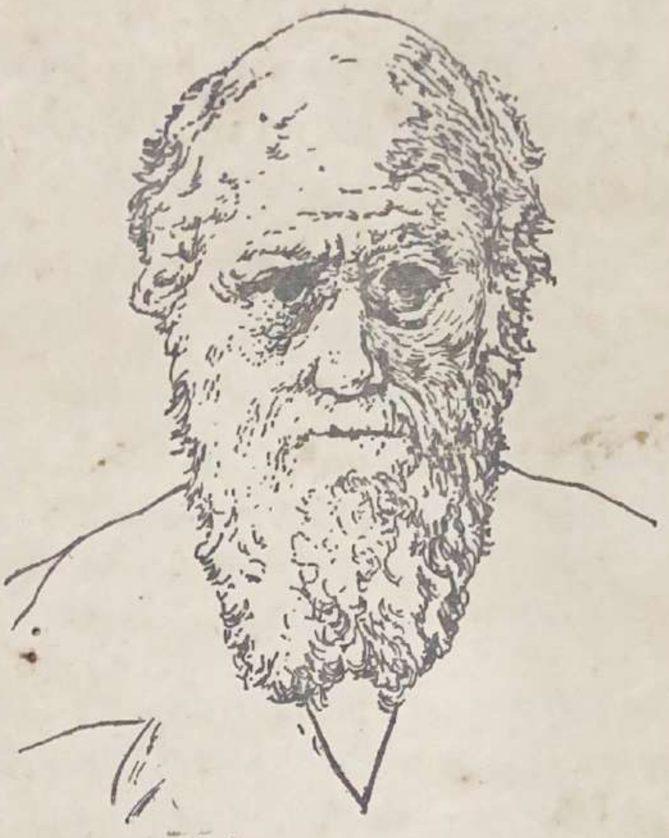

চার্লস রবার্ট ডারউইন

১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী। বিশ্বের ইতিহাসে এটি একটি মহান দিন। এই দিনটিতে দু'টি ভিন্ন মহাদেশ ইউরোপ ও আমেরিকায় জন্ম হয়েছিল দু'জন মহামানবের। বিশ্বের ইতিহাসে এমন অপরূপ সমন্বয় খুঁজে মেলা ভার। এঁদের একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এনেছেন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন। নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষকে দিয়েছেন দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি। তিনি ঘোষণা করেছেন গণতন্ত্রের নতুন সংজ্ঞা 'দেশের সরকার হবে জনগণের সরকার, তাদের দ্বারা নির্বাচিত- এবং তাদের কল্যাণেই নিয়োজিত।' অপর একজন মহাপুরুষ মানুষের চিন্তা জগতে এনেছেন আমূল পরিবর্তন। বিজ্ঞানের একটি অধ্যায়ে মহাবিপ্লবের সূচনা করেছেন তিনি মানুষের অন্ধ গোঁড়ামি আর অজ্ঞতার বিরুদ্ধে জীব জগতের জন্ম

সম্বন্ধে সম্পূর্ণ এক নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন। এঁদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যিনি সামাজিক বিপ্লব এনেছেন তাঁর নাম আব্রাহাম লিঙ্কন ও জীববিজ্ঞানে বিপ্লব এনেছেন রবার্ট চার্লস ডারউইন। এঁদের নাম অনন্তকাল ধরে মানুষের স্মৃতি পটে অমর হয়ে থাকবে।

চার্লস ডারউইনের পিতার নাম রবার্ট ডারউইন। ইংল্যাণ্ডের শ্রুস্‌বেরীতে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। চিকিৎসা-বিদ্যা ছিল তাঁর পেশা। চার্লস ডারউইনের পিতামহের নাম এরাসমাস ডারউইন। তিনি একজন নাম করা ডাক্তার ছিলেন। লিচফিল্ডে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তাঁর বাড়ীর সামনে নানান জাতীয় উদ্ভিদের একটা চমৎকার বাগান ছিল। চিকিৎসা-বিদ্যা তাঁর পেশা হলেও তিনি মাঝে মাঝে উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করতেন—এদের জন্মবৃত্তান্তের হদিস খুঁজতেন। এরাসমাস ডারউইন মাঝে মাঝে কবিতাও লিখতেন। তাঁর কবিতা খুব উঁচুমানের না হলেও এতে থাকতো মুক্ত চিন্তাধারা ছোঁয়াচ। বাস্তব সত্য সমূহ তাঁর কবিতায় রূপে-রসে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতো।

এরাসমাস ডারউইনের পৌত্র চার্লস ডারউইনের বাল্যকাল কেটেছে অতি সাধারণভাবে। এ সময় তাঁর মধ্যে ভবিষ্যতে বিখ্যাত হওয়ার কোন লক্ষণই ফুটে উঠেনি। অন্যান্য সাধারণ ছেলেদের মত তিনিও ছিলেন একজন। চার্লসদের ভাই-বোনের সংখ্যা ছিল মোট ছ'জন। তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম। মাত্র আট বছর বয়সের সময় তাঁর মাতার মৃত্যু হয়। তিনি পিতার স্নেহ ও বড় বোন সুসানের অধিক আদর-যত্নে প্রতিপালিত হয়েছেন। চার্লস আজীবন কখনও এদের স্মৃতি ভুলতে পারেননি।

ছোটবেলায় বাড়ীতে বসে চার্লস মোটেই লেখাপড়া করতে চাইতেন না। শুধু খেলাধুলা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন সারাক্ষণ। এ নিয়ে তাঁর অভিভাবকদের চিন্তার অবধি ছিল না। তাঁর বয়স যখন ন' বছর তখন তাঁকে শ্রুসবারীর একটি বিখ্যাত আবাসিক স্কুলে ভর্তি করানো হয়। সেখানে

অত্যন্ত কড়াকড়ির সাথে লেখাপড়া ও শিষ্টাচার শেখানো হতো। কিন্তু বড় হয়ে চার্লস মাঝে মাঝে বলতেন যে ওই স্কুলটাই ছিল তাঁর বুদ্ধি বিকাশের প্রধান অন্তরায়। সেখানকার ধরাবাঁধা নিয়ম-কানুন তাঁর মোটেও পছন্দ হতো না।

অপরপক্ষে, চার্লসের শিক্ষকরা বলতেন অন্য কথা। তাঁদের মতে চার্লস ছাত্র হিসেবে মোটেই ভাল ছিলেন না। তাঁর লেখাপড়ার মান খুবই সাধারণ ছিল—এমন কি মোটামুটি মানেরও নীচে। ক্লাসের পরীক্ষাগুলোতে তিনি খারাপ ফল করতেন। পড়াশুনায় তাঁর মোটেও মনযোগ ছিল না। একটু সুযোগ পেলেই তিনি শিকারে যেতেন; কুকুর নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন কিংবা ইঁদুর ধরতেন আর পোকা-মাকড়ের পিছু ছুটে দিন কাবাড় করতেন। এসব কারণে তাঁর পিতা প্রায়ই তাঁকে ভর্ৎসনা করতেন। কিন্তু অপর একটা জিনিসের প্রতি তাঁর প্রাণের টান ছিল। এজন্য অনেকেই তাঁর প্রশংসা করতেন। এটি রসায়ন-শাস্ত্র। চার্লস তাঁর বড় ভাইয়ের সহযোগিতায় বাড়ীতে একটা রাসায়নিক পরীক্ষাগারও নির্মাণ করেছিলেন। রসায়নের প্রতি তাঁর গভীর ঝোঁক দেখে তাঁর বন্ধু-বান্ধবও ভাইবোনেরা তাঁকে "গ্যাস" নামে ডাকতেন।

মাত্র ষোল বছর বয়সে চার্লসের পিতা ডাক্তারী পড়ানোর অভিপ্রায়ে চার্লসকে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। কিন্তু এতে চার্লসের মোটেও মন বসতো না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কোন শাখাই তাঁর মনকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। বছর তিনেক এমনি ভাবেই কেটে গেল। এরপর, চার্লস এডিনবরা ছেড়ে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। এখানে তিনি একুশ বছর বয়সে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মাঝে মাঝে তিনি বন-জঙ্গল পর্যটনে বেরিয়ে পড়তেন। এতে তিনি আনন্দ পেতেন অনেক বেশী। কীট-পতঙ্গ, গোবরে পোকা, শূয়োপোকা প্রভৃতি সংগ্রহ করতেন তিনি। একবার তিনি পোকা সংগ্রহ করতে গিয়ে একটা মজার কাণ্ড করে বসলেন।

একটা গাছের পুরাতন বাকলের নীচে একবার দু'টো নতুন ধরনের পোকা দেখতে পেলেন। অতি কষ্টে পোকা দু'টো দু'হাতে ধরলেন। তারপর বাকলের নীচে আরও একটা পোকা দেখতে পেলেন। হঠাৎ জিদ চেপে বসলো—ওটাও তাঁর চাই। তাই তাড়াতাড়ি একটা পোকাকে মুখের মধ্যে কামড়ে ধরে তৃতীয়টির জন্য হাত বাড়ালেন। মুখের পোকাটি তখন সুযোগ বুঝে চার্লসের মুখে চট্ করে এক প্রকার তরল পদার্থ ছেড়ে দিল। আর যাবে কোথা—সাথে সাথেই মুখের মধ্যে বেদম জ্বালা-পোড়া শুরু হলো। অসহ্য বেদনায় হাঁ করতেই সুযোগ বুঝে মুখের পোকাটি ছুটে গেল; তৃতীয়টিও প্রাণভয়ে পালিয়ে বাঁচলো। একটা বেশী পোকা ধরতে গিয়ে তিনি অপর একটিও হারালেন।

প্রকৃতিকে জানবার এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এর প্রতিটি রহস্য অনুসন্ধান করবার তীব্র বাসনা তাঁর মনে জাগিয়েছিলেন ডঃ গ্রাণ্ট নামক তাঁর এক বন্ধু। ডঃ গ্রাণ্ট নিজেও ছিলেন একজন জীববিজ্ঞানী। তাঁরই প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে চার্লস ডারউইন উৎসাহ আর উদ্দীপনায় ভরা মন নিয়ে একাকী সমুদ্রের তীরে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন ও তথাকার জীব-জন্তু পরীক্ষা করতেন। কোথাও কোন নতুন ধরনের পোকা-মাকড় পেলেই তিনি তা' সংগ্রহ করতেন। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস কালে তাঁর অবসর সময়গুলো সাধারণতঃ লেখাপড়া, শিকার ধরা, তাস খেলা আর পোকা-মাকড় সংগ্রহ প্রভৃতিতেই কেটে যেত। এতে তিনি প্রচুর আনন্দ পেতেন।

এই সময় তিনি একদিন হামবোল্টের লেখা "ব্যক্তিগত বর্ণনা" নামক একখানা বই পড়লেন। এ বই পড়ে আনন্দ আর উৎসাহে তাঁর মন লাফিয়ে উঠলো। হাজার বার বইটার তারিফ করলেন তিনি। প্রকৃতির জীব-জন্তু সম্বন্ধে এতো সুন্দর বর্ণনা এর পূর্বে তিনি আর কোথাও দেখেননি। এদের জন্মবৃত্তান্ত জানবার বাসনা তাঁর মনে আরও তীব্রতর হয়ে দেখা দিল। তাই আরও অধিক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে তিনি কীট-পতঙ্গের গতি প্রকৃতি ও আচার-বিধি নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। এদের প্রত্যেকের

জন্ম ইতিহাস জানবার চেষ্টা করলেন তিনি। এই সময় হেনসল নামক একজনউদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপকের সাথে চার্লস ডারউইনের পরিচয় হয়। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সাথে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জমে উঠে। তিনি প্রায় সময়ই হেনসল-এর সাথে জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। একমাত্র তাঁরই পরামর্শে চার্লস ডারউইন ভূবিদ্যা সম্বন্ধে অতিরিক্ত পড়াশুনা করেছিলেন।

চার্লস ডারউইন তখন শ্রুসবেরীতে অবসর যাপন করছিলেন। এই সময় তিনি একদিন অধ্যাপক হেনস্‌ল-এর লেখা একখানা চিঠি পেলেন। চিঠি খানা পড়ে আনন্দে মন তাঁর নেচে উঠলো। এতো বড় স্বুবর্ণ স্বুযোগ ক'জনারই বা জীবনে আসে? অধ্যাপক হেনস্‌ল চার্লসের জন্য বীগ্‌ল যাত্রার ব্যবস্থা করেছেন। বীগল একটা সমুদ্র জাহাজের নাম। জলপথে বাণিজ্যের স্বুবিধার জন্য নতুন পথের সন্ধান করাই ছিল এর কাজ। জাহাজের নাবিকের নাম ছিল ক্যাপ্টেন ফিট্‌জরয়। তিনি এ সমুদ্রযাত্রায় একজন বিজ্ঞানীকে সাথে নেওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন।

তাই অধ্যাপক হেনস্‌ল চার্লসকে জানালেন, 'এর জন্য তুমিই উপযুক্ত ব্যক্তি। এরা তোমার ন্যায় একজন উৎসাহী লোকের সন্ধান করছে। কিন্তু চার্লসের পিতা একথা শুনে একদম বেঁকে বসলেন। তিনি বললেন চার্লসের যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না। এটা অসম্ভব। স্নেহের পুত্রকে তিনি সমুদ্রযাত্রায় যেতে দিতে নারাজ হলেন। চার্লস তখন কোন উপায় না দেখে তাঁর এক চাচার কাছে ধর্ণা দিলেন। তাঁর চাচার নাম ওয়েজউড্‌। তিনি চার্লসের পিতাকে এ ব্যাপারে অনেক বুঝালেন, শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁকে সম্মত করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর পিতা সম্মত হওয়ার পরের দিনই চার্লস ডারউইন ক্যামব্রিজের পথে রওনা হলেন। তথায় তিনি প্রথমতঃ অধ্যাপক হেনসল-এর সাথে দেখা করলেন; তারপর লণ্ডনে এসে ক্যাপ্টেন ফিট্‌জরয়ের সাথে সমুদ্রযাত্রার কথা পাকাপাকি করলেন।

ক্যাপ্টেন ফিৎজরয় চার্লস ডারউইনকে দেখে খুব খুশী হলেন। তিনি মনে মনে বললেন, এমন উপযুক্ত লোকেরই তাঁর প্রয়োজন। সাথে সাথেই তিনি চার্লসকে জাহাজের প্রাকৃতিক তত্ত্বজ্ঞ নিযুক্ত করলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে জীব-জগতের জন্ম সম্বন্ধে ডারউইনের দেওয়া মতবাদ পড়ে সব চেয়ে বেশী মর্মাহত হয়েছিলেন তিনি। তিনি প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন, সমুদ্রযাত্রার পূর্বে তিনি যদি এর সামান্যতম আভাসও পেতেন, তবে কখনই তাঁকে এ যাত্রার শরিক হতে দিতেন না।

১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে সুযোগ্য নাবিক ক্যাপ্টেন ফিৎজরয়ের নেতৃত্বে দক্ষিণ আমেরিকার পথে বীগ্‌লের যাত্রা শুরু হলো। তাঁদের এ সমুদ্রযাত্রা দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে চললো। আজ এখানে কাল সেখানে এমনিভাবেই তাঁদের অনুসন্ধান কার্য অব্যাহত রইলো। বীগ্‌ল শুধু দক্ষিণ আমেরিকার পোতাশ্রয়ে অবস্থান করেই ক্ষান্ত হলো না; এটি তাহিতি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, তাসমানিয়া, মালদ্বিপ প্রভৃতি দেশের উপকূলেও ভিড়লো। চার্লস ডারউইন দেখলেন, এই-ই ত' সুযোগ। যেখানেই জাহাজ ভিড়লো সেখানেই তিনি বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি জায়গায় অনুসন্ধানী মন নিয়ে ঘুরলেন। এসব স্থানে ডারউইন নানান্ রকমের পুরাতন হাড়, কঙ্কাল, পাথর প্রভৃতি পড়ে থাকতে দেখলেন। এমন নতুন ধরনের বস্তু তিনি এর পূর্বে আর কখনও দেখেননি। এগুলো ফসিল নামে পরিচিত। অতি পুরাকালের জীব-জন্তসমূহের মৃতদেহে ধূলাবালি, কাদা-মাটি জমে যে কঠিন পাথরের সৃষ্টি হয় তাকেই ফসিল বলে। চার্লস ডারউইন যেখানে ঘুরলেন সেখান থেকেই কিছু কিছু ফসিল সংগ্রহ করলেন।

সমুদ্র ভ্রমণের পর চার্লস ডারউইন কিছুদিনের জন্য বেশ ব্যস্ত রইলেন, তাঁর মোটেই ফুরসৎ মিললো না। এই সময় তিনি বীগ্‌ল যাত্রার বৃত্তান্ত লিখে ছাপানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এর মধ্যেই বছর দুই কেটে গেল। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'জিয়োলজিক্যাল সোসাইটির' সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিন বছর ধরে তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর

চাচাত বোন এমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন এবং লণ্ডন শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে মনস্থির করেন। কিন্তু এর বছর দুই পরেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি লণ্ডন ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ডন-এ চলে আসেন।

অজীর্ণ রোগই ছিল চার্লস ডারউইনের জীবনে সুখ-শান্তির প্রধান অন্তরায়। এই রোগে কখনও কখনও তিনি অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়তেন। অবশ্য এর জন্য তিনি নিজেই অনেকাংশে দায়ী ছিলেন। কেননা, রোগের প্রাথমিক স্তরে তিনি কখনও ডাক্তার ডাকতেন না বা চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত করতেন না। দিন-রাত তিনি শুধু কাজই করতেন। তারপর রোগ যখন উত্তরোত্তর বেড়ে যেত তখন তিনি নিরূপায় হয়ে কাজে ক্ষান্ত দিতেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হলেই পুনরায় শুরু করতেন বেদম খাটুনী। এমনি ভাবেই কেটেছিল তাঁর সারাটা জীবন।

বীগ্‌লে ভ্রমণকালে তিনি যে-সব ফসিল সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলো গবেষণা শুরু করলেন। একটার সাথে অপরটার একটা ধারাবাহিক মিল খুঁজে পেলেন তিনি। মাঝে মাঝে লক্ষ্য করলেন যে, এক জায়গার ফসিলের সাথে অপর জায়গার ফসিলের অতি সামান্য পার্থক্য রয়েছে। তিনি মনে মনে প্রশ্ন করলেন, কেন এসব ফসিলের একটার সাথে অপরটার এতো অধিক মিল; আর কেনই বা কোন কোনটার ধারাবাহিকতায় ঈষৎ পরিবর্তন দেখা যায়? চার্লস ডারউইন এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেন; জীব-জন্তর বিবর্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে নতুন কিছু বলতে চাইলেন।

১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে প্রাকৃতিক বিবর্তনের উপর চার্লস ডারউইন একটা খসড়া তথ্য তৈরী করলেন। এটা ছিল পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় লেখা একখানা বই। শুধুমাত্র সারাংশ। এর এক লাইনের ব্যাখ্যার জন্য কয়েক পৃষ্ঠা কাগজের প্রয়োজন হতো। এতে তিনি বললেন, যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমেই জীব-জগতের পরিবর্তন হয়। সে পদ্ধতি এখনও অব্যাহত রয়েছে—এমন কি; ভবিষ্যতেও তা' চলতে থাকবে।

চার্লস ডারউইন তাঁর এ বিবর্তনবাদের গুরুত্ব আগে থেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি একথা ভালভাবেই জানতেন যে, এই তথ্য প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই বিশ্বের প্রতিটি স্থান থেকে তুমুল প্রতিবাদের ঝড় উঠবে। প্রায় প্রত্যেকেই এর বিরোধিতা করবে! গোঁড়া ধার্মিকরা বলবে, ডারউইনের ন্যায় এমন একজন নাস্তিককে জীবন্ত সমাধিস্থ করা প্রয়োজন—এমনি আরও কত কি। এই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করেই তিনি তাঁর 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকলেন।

এরপর, চার্লস ডারউইন তাঁর 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তথ্যকে' নির্ভুল প্রমাণের জন্য আরও নানান্ ধরনের পরীক্ষাকার্য চালালেন। দিন-রাত তিনি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটলেন। হরেক রকমের পাখীর হাড় সংগ্রহ করে নিজে নিজেই তা' সাজালেন। নিজের গবেষণাগারে পারাবতের প্রজনন দেখলেন ও আরও কতশত পরীক্ষা চালালেন। এসব পরীক্ষার ফলাফল তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের কাছে লিখে জানাতেন। এদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ লায়ল, হুকার ও উদ্ভিদবিদ আশা গ্রে। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে লায়ল তাঁকে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তথ্যটি প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। তদনুযায়ী ডারউইন এটি লিখতে শুরু করলেন।

এই সময় হঠাৎ ডারউইন একদিন একখানা চিঠি পেলেন। পত্র লেখকের নাম আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস। এই পত্র পড়ে চার্লস ডারউইন মর্মাহত হলেন। মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুই ধূলিস্মাৎ হয়ে গেল। ওয়ালেস তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ডারউইনের কাছে পত্র লিখেছেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তা' ডারউইনের পরীক্ষার ফলাফলের সাথে হুবহু মিলে গেল। এতে তিনি হতভোম হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ না করার জন্য মনস্থির করলেন। বন্ধু-বান্ধবগণ তখন তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, দু'জন বৈজ্ঞানিক একই সাথে তাঁদের গবেষণালব্ধ একই রকমের তথ্যাবলী প্রকাশ করলে কোন ক্ষতি হয় না; এতে

উভয়ই সমানভাবে প্রসংশা পেয়ে থাকেন। আবিষ্কারকদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে কেউই অস্বীকার করেন না। অবশেষে, চার্লস ডারউইন এ প্রস্তাবে রাজী হলেন। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর "দি অরিজিন অব এসপেসিস" নামক বিখ্যাত বইখানা প্রকাশ করলেন।

ডারউইনের এ বইখানা সারা বিশ্বে এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি করলো। জীব-জগতের জন্ম সম্বন্ধে মানুষের আদিকালের সেই পুরাতন ধারণার ভিত কেঁপে উঠলো। প্রকম্পিত হলো গোঁড়া ধার্মিক ও কুসংস্কারবাদীর দল। মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডারে এক নতুন বিপ্লব সূচিত হলো। বইখানা যেদিন প্রকাশিত হলো ঠিক সেই দিনই ১২৫০ খানা বই নিঃশেষিত হলো। যারা দেরী করে এ বই কিনতে গেল, তাদের পরবর্তী মুদ্রণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে হলো।

এই বইয়ে চার্লস ডারউইন তাঁর বিখ্যাত বিবর্তনবাদের কথা লিখলেন। তিনি এতে বললেন, বর্তমান পৃথিবীতে আমরা জীব-জন্তুর যে রূপ দেখছি অতীতে তা' এরূপ ছিল না। মানুষ কিংবা অন্যান্য প্রাণী পৃথিবীতে একদিনে জন্ম নেয়নি কিংবা বড়ও হয়নি। এরা এসেছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের ফলস্বরূপ এরা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করছে। এদের মধ্যে বিভিন্নতা আর বৈচিত্র্য দেখা যায় মূলতঃ দু'টি কারণেঃ একটি দৈহিক নির্যাতনের জন্য ও অপরটি তার নিজস্ব মনোবৃত্তির প্রেরণায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি যুদ্ধ করে যারা জয়ী হতে পারে তারাই শুধু বেঁচে থাকে আর অন্যগুলো পৃথিবীর বুক থেকে বিলীন হয়ে যায়। অর্থাৎ যাদের শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে, তারা প্রাকৃতিক বিপাকেও সমতা বা সামঞ্জস্য রক্ষা করে টিকে থাকতে পারে। একথার প্রমাণস্বরূপ তিনি হাজির করেছেন নানা ধরনের ফসিলের নির্ভুল বিশ্লেষণ। তিনি জোরের সাথে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর এ মতবাদ ভুল হতে পারে না। একদিন না একদিন সবাইকে এ মতবাদ মেনে নিতেই হবে।

বিবর্তনবাদ প্রচারের সাথে সাথেই প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। ১৮৬০

খ্রীস্টাব্দে জুন মাসের শেষের দিকে এ নিয়ে আলোচনার জন্য বৃটিশ এসোসিয়েশনের একটা সভা আহূত হলো। বিরুদ্ধবাদীরা এ সভায় চার্লস ডারউইনকে আক্রমণের একটা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র আঁটলো। এ ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে তিনি সভায় যোগদান থেকে বিরত থাকলেন। তাঁর পক্ষ সমর্থন করে বক্তৃতা দিলেন হুকার, হাক্সলি প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা। তাঁরা শত্রুদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের দাঁত ভাঙ্গা জওয়াব দিলেন। এদের দলে ভিড় জমালেন হার্বাট, স্পেনসার, হিকেল, সার্লে উড, রামসে, রজার, ওয়াটসন ও আরও অনেকেই।

আস্তে আস্তে চার্লস ডারউইনের বিপ্লব আনয়নকারী বিবর্তনবাদ চারদিক থেকে সমর্থন পেতে লাগলো। সমর্থকদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চললো। পরিশেষে চরম বিরোধীদেরও সুর ক্ষীণ হয়ে এলো। বস্তুতঃ এ মতবাদ সমর্থন করে তারা এক নতুন যুক্তি দাঁড় করলো। তারা বললো, ডারউইনের মতবাদ প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসকে অস্বীকার করেনা—এটা-ধর্ম বিরোধী মতবাদ নয়। ফলে, চার্লস ডারউইনের জয় হলো, তাঁর প্রচারিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী মতবাদটি সবার কাছে স্বীকৃতি পেল। এর সাথে সাথে অপর একটি বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হলো : বিবর্তনবাদের ন্যায় অন্য কোন মতবাদই এতো বেশী সমালোচিত হওয়ার পর এতো শীঘ্র স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

চারদিকে যখন বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় বইছিলো, চার্লস ডারউইন তখন নিবিষ্ট মনে এই বিবর্তনবাদের আরও উৎকর্ষ সাধনের জন্য গবেষণায় ব্যস্ত রইলেন। মাঝে মাঝে তিনি উদ্ভিদ নিয়েও নানা ধরনের গবেষণা চালালেন। এ-গবেষণার ফলাফল নিয়ে তিনি আরও দু'খানা বই প্রকাশ করলেন।

তারপর, ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে চার্লস ডারউইন অপর একখানা বিখ্যাত বই প্রকাশ করলেন। এর নাম "দি ডিসেণ্ট অব ম্যান"। এতে তিনি মানুষ কি করে বর্তমান রূপ পেলো তাই নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, সারা অঙ্গে পশমে আবৃত এক প্রকার চতুষ্পদ জন্তু থেকে মানুষ

তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। তিনি মানুষের পূর্বপুরুষ হিসেবে বনমানুষকে দাঁড় করালেন। পরবর্তীকালে অবশ্য তাঁর এ মতবাদের কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে : অতি ক্ষুদ্র জীব-জন্তুর বিবর্তনের ফলেই আজকের দিনের মানুষের সৃষ্টি হয়েছে।

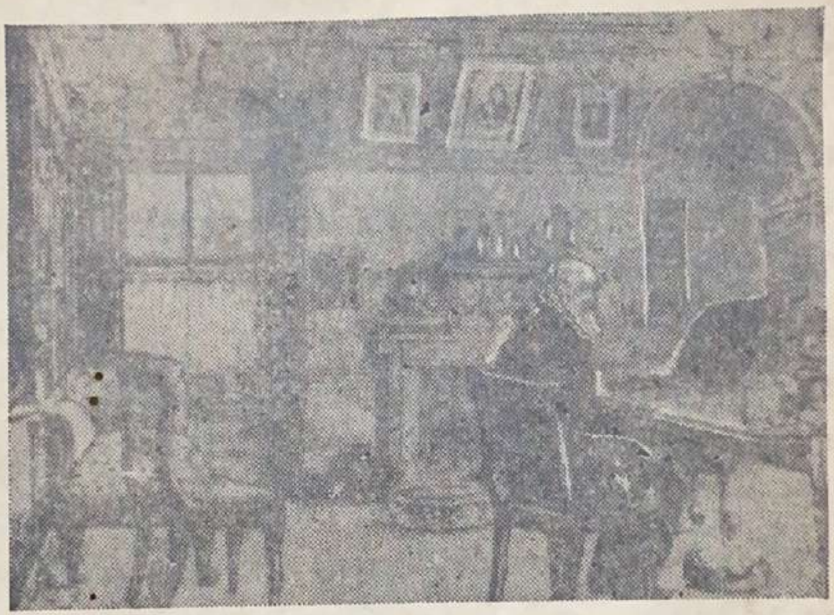

[গবেষণাগারে ডারউইন]

জীবনের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত চার্লস ডারউইন গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। গবেষণার ফলাফল লেখার চেয়ে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেই তিনি আনন্দ পেতেন সবচেয়ে বেশী; লিখতে তাঁর মনছিল সব সময়ই নারাজ। অবসর বিনোদনের জন্য তিনি উপন্যাস সাহিত্য পড়তে ভালবাসতেন। যে-সব উপন্যাসে আনন্দের সমাপ্তি থাকতো, সে-সবের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের কোন ভাল উপন্যাসই তাঁর নজর এড়াতো না।

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল তারিখে বিজ্ঞানের এই একনিষ্ঠ সাধকের মৃত্যু হয়। মানুষের চিন্তা জগতে তিনি যে বিপ্লব এনেছেন, সেজন্য অনন্ত কাল ধরে মানুষের স্মৃতিপটে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

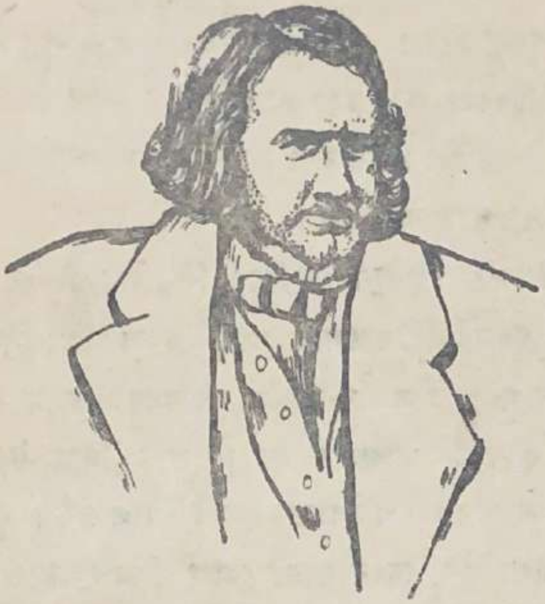

স্যার জেমস্ ইয়ং সিমপ্‌সন

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কথা। এই সময় এডিনবরায় একদিন একটি ছোট্ট মেয়ে ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোন চিকিৎসাই কার্যকরী হলো না। অবশেষে, মেয়েটির শরীরে অস্ত্রোপচার করতে হলো। সিমপ্‌সন নামক ডাক্তারী বিদ্যার একজন ছাত্র মেয়েটিকে ধরলেন ; আর তাঁর অধ্যাপক প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী মেয়েটির শরীরে অস্ত্রোপচার করলেন। তার ক্ষতস্থান দিয়ে গলগলিয়ে রক্ত বের হলো। অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করলো সে। বুক ভাঙ্গা আর্ত চিৎকার ধ্বনিত হলো। এ আর্ত চিৎকারে কার না প্রাণে বেদনার উদ্রেক হয় ? সিমপ্‌সনেরও মন তাই দুঃখ আর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে রইলো। তিনি সেদিন থেকেই মনে মনে পণ করলেন—নিশ্চয়ই এমন কোন ঔষধ আবিষ্কার করা প্রয়োজন যদ্বারা মানুষকে কিছু সময়ের জন্য অসাড় করা সম্ভব। এর ফলে নানুষকে অস্ত্রোপচারকালীন অসহ্য যাতনার হাত থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হবে।

সিমপ্‌সনের সেদিনের সে চিন্তা পরবর্তীকালে বাস্তবায়িত হয়েছিল। তিনিই সর্বপ্রথম 'ক্লোরফরম' নামক রাসায়নিক দ্রব্যটির অসাড় করার ক্ষমতার কথা ঘোষণা করেন। তাঁর এ আবিষ্কারের ফলে হাসপাতালগুলোতে রোগীদের আর্ত চিৎকার ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। মানুষ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ার অবকাশ পেয়েছিল। বস্তুতঃ সিমপ্‌সনের আবিষ্কার মানব সভ্যতায় এক নতুন যুগের সূত্রপাত করেছিল।

১৮১১ খ্রীস্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে লিনলিথগৌ-এর বাথ্‌বেট নামক গ্রামের সামান্য একজন রুটিওয়ালার ঘরে জেম্‌স ইয়ং সিমপ্‌সন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের সংসারে অভাব-অনটন সব সময়ই লেগে থাকতো। রুটি বিক্রি করে যা' দু'পয়সা রোজগার হতো, তাই দিয়ে টানাটানির মধ্যে চলতো তাঁদের সংসার। পরিবারের সবাই মিলে রুটির কাজই করতেন। মা-বাবার বড় আশা ছিল, যেমন করেই হোক সিমপ্‌সনকে তাঁরা লেখাপড়া শেখাবেন। রুটি তৈরীর কাজে তাঁকে নিয়োগ করতে তঁদের মন চাইতো না। তাই, সিমপ্‌সনের জন্মের পর থেকেই তাঁরা অতি কষ্টে যৎসামান্য টাকা পয়সা জমাতে লাগলেন।

ছোটবেলা থেকেই সিমপ্‌সন ছাত্র হিসেবে খুব মেধাবী ছিলেন। তাঁর বুদ্ধি ছিল খুবই প্রখর। পাড়ার অন্যান্য ছেলেরা তাঁর বুদ্ধিমত্তার কাছে হার মানতো। যে-কোন কাজে তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল। খেলাধুলাতেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত পটু। অতি অল্প দিনের মধ্যেই পাড়াময় তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি তাঁর পিতাকে রুটি তৈরীর কাজে সাহায্য করতেন। এতে তিনি লেখাপড়ার সময় পেতেন কম। তাই তিনি অনেক রাত জেগে পড়াশুনা করতেন।

সিমপ্‌সনের অধ্যাবসায় ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে বাবা-মা'র ইচ্ছে হলো যে, ছেলেকে ডাক্তারী পড়াবেন। কেননা, সে-যুগে সমাজে ডাক্তারদের স্থান ছিল অনেক উঁচে। এতে বেশ টাকা-পয়সাও রোজগার হতো। তাই তাঁরা মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে সিমপ্‌সনকে এডিনবরায় পাঠিয়ে দেন।

প্রথমে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগে ভর্তি হন। এর বছর দুই পর তিনি চিকিৎসা বিভাগে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। ঔষধ বিষয়ে নিজেকে একজন পারদর্শী হিসেবে গড়ে তোলার কাজে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন তিনি। মাত্র একুশ বছর বয়সে সিমপ্‌সন ডাক্তারী ডিগ্রি লাভ করেন।

এর অল্পদিন পর তিনি "যন্ত্রণায় মৃত্যু" নামক একটি সুন্দর তথ্যবহুল প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এতে তিনি রোগ যাতনা সম্বন্ধে অনেক নতুন নতুন তথ্য পরিবেশন করলেন; সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট উপায়ে এর কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করলেন। প্রবন্ধটি চারদিকে উচ্চ প্রশংসা লাভ করলো। সাথে সাথে সিমপ্‌সনের সামনে সৌভাগ্যের দ্বারও উন্মোচিত হলো। তাঁর এ প্রবন্ধে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে ডাঃ জন থমসন নামক একজন অধ্যাপক সিমপ্‌সনকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ছিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথোলজি বিভাগের অধ্যক্ষ। অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তিনি সিমপ্‌সনকে তাঁর সহকারী নিযুক্ত করতে চাইলেন। সিমপ্‌সন সাথে সাথেই এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই এ চাকুরীতে সিমপ্‌সন তাঁর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিলেন। তিনি ভাবলেন, এটাই তাঁর প্রকৃত কর্মস্থল। এমন সুযোগ না পেলে কি কখনও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ লাভ ঘটে? সিমপ্‌সনের অধ্যাবসায় দেখে অধ্যাপক থমসন তাঁর প্রতি আরও আকৃষ্ট হন। এই সময় একবার তাঁর স্বাস্থ্যের দারুণ অবনতি ঘটে। তিনি দীর্ঘ এক বছর অবসর যাপনের জন্য মনস্থির করলেন এবং ছুটির প্রাক্কালে তাঁর সম্পূর্ণ কর্মভার সিমপ্‌সনের উপর ন্যস্ত করলেন। সিমপ্‌সনও দক্ষতার সাথে এ গুরুভার যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। এটা ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের কথা।

তথাপি সিমপ্‌সনের মনে মোটেই শান্তি ছিল না। মানুষের রোগ-শোক ও যন্ত্রণা নিরশনের কথাই ভাবতেন তিনি। অস্ত্র চিকিৎসার সময় রোগীর কাতরানি ছিল তাঁর একদম সহ্যের বাইরে। তা'ছাড়া ছাত্রাবস্থায়

দেখা সেই অসহায় ছোট্ট মেয়েটির দেহে অস্ত্রোপচারের দৃশ্য তাঁর মনে বার বার আঘাত হানতো। এর সাথে সিমপ্‌সনের মানসপটে আরও অন্যান্য করুণ দৃশ্যসমূহ ভেসে উঠতো। তখনকার দিনে রোগীদের শরীরে অস্ত্রোপচারের সময় খাটের সাথে তার হাত-পা বেঁধে ফেলা হতো। এতে রোগীরা ডাক্তারদের সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তি বা অস্ত্রোপচারে বাধা প্রদান করতে পারতো না। কিন্তু তার চোখের সামনেই অন্য টেবিলে পড়ে থাকতো অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি। সজ্ঞানে সে সব কিছু অবলোকন করতো। ভয়ে তার সমস্ত শরীর শিউরে উঠতো ও সকরুণ চিৎকারে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠতো। এই সময় হাসপাতালের পাশ দিয়ে চলাফেরা করা ছিল নিতান্তই দুরূহ কাজ।

অস্ত্রোপচারের আগে রোগীর নাকের কাছে আলকাতরার গন্ধ ভুর ভুর করতো। আশে-পাশে কোথাও হয়ত বা তা গলানো হতো। রোগী এ কথা সহজেই বুঝতে পারতো যে, অস্ত্রোপচারের পর তারই ক্ষতস্থানে এই আলকাতরা ঢেলে দেওয়া হবে। এরূপ অমানুষিক দৃশ্য ক'জনই বা সহ্য করতে পারে? তাই দেখা যেতো, কাতরাতে কাতরাতে প্রায় রোগীই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। অস্ত্রোপচারের পূর্বে এইভাবে যারা অজ্ঞান হতো; সেই অবস্থাতেই তাদের শরীরে অস্ত্রচিকিৎসা করা হতো। এইসব অজ্ঞান রোগীরা যখন জ্ঞান ফিরে পেতো—তখন তারা আল্লাহর কাছে হাজার শোকরিয়া জানাতো। কেননা, আত্মহত্যার সামিল এই নিদারুণ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার হাত থেকে সে রেহাই পেয়েছে।

এসব নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করলেও সিমপ্‌সন চট্‌ করে একটা কিছু সমাধান খুঁজে বের করতে সক্ষম হননি। তখন তিনি বেশীর ভাগ সময়ই ব্যস্ত থাকতেন নিজের পড়াশুনা ও ক্লাসে ছাত্র পড়ানোর কাজ নিয়ে। এই সময় তিনি ধাত্রীবিদ্যাও বিশেষভাবে আয়ত্ত করেন। তা'ছাড়া অধ্যাপক থমসনের স্থলাভিশিক্ত হয়ে তাঁকে প্যাথোলজি বিষয়েও জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছিল। এসব বিষয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসগুলোতে বক্তৃতা দিতেন। তাঁর বক্তৃতা ছিল খুবই উচ্চমানের।

১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধাত্রীবিদ্যা বিভাগে একজন অধ্যাপকের পদ খালি হয়। সিমপ্‌সন এ সুযোগ ছাড়লেন না। তিনি সাথে সাথেই একখানা দরখাস্ত করলেন। কিন্তু এতে একটা সাময়িক বাধা এসে দাঁড়ালো। সে সময় নিয়ম ছিল যে, বিবাহিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউই ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হতে পারবেন না। এই কথা শুনতে পেয়ে সিমপ্‌সন লিভারপুলের জেসি গ্রীণ্ডলের সাথে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর পরই তিনি ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

যতই দিন যেতে লাগলো, ততই সিমপ্‌সনের চিন্তার অবধি রইলো না। অস্ত্রোপচারকালীন রোগীর আর্তচিৎকার তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো। তিনি যে-সব স্ত্রীলোকের শরীরে অস্ত্রোপচার করতেন তাদের করুণ আকুতি-মিনতি তাঁকে প্রায় সময়ই বিচলিত করে তুলতো। তিনি মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন: যত শীঘ্রই হোক এর একটা বিহিত না করলেই নয়।

বছর কয়েক কেটে গেল। হঠাৎ সিমপ্‌সন একদিন আমেরিকার মরটন নামক একজন দন্ত চিকিৎসকের কথা শুনতে পেলেন। তিনি দাঁত উত্তোলনের কাজে 'ইথার' নামক এক প্রকার অসাড়ক দ্রব্য ব্যবহার করে থাকেন। এটা শোঁকানোর অল্প সময়ের মধ্যেই রোগী অসাড় হয়ে পড়ে এবং এই অবস্থায় দাঁত উত্তোলন করা হয়। এতে পূর্বের ন্যায় ক্ষত স্থান দিয়ে গলগলিয়ে রক্তক্ষরণ হয় না। একথা শুনার সাথে সাথেই সিমপ্‌সন এ বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

ডাঃ মরটনেরও বহু বছর পূর্বে সার হ্যামফ্রে ডেভী নামক অপর একজন বৈজ্ঞানিক অস্ত্র চিকিৎসায় অসাড়ক দ্রব্য ব্যবহারের কথা প্রথম উল্লেখ করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ডেভীর এ প্রস্তাব দীর্ঘ দিন ধরে কেউই বাস্তবে রূপায়িত করতে উৎসাহী হননি। বৈজ্ঞানিক ডেভী এক প্রকার হাস্যোদ্দীপক গ্যাসকে অসাড়ক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহারের কথা বলেছিলেন। ডাঃ মরটন তদস্থলে 'ইথার' নামক রাসায়নিক দ্রব্যটি ব্যবহার করেছিলেন।

অসাড়ক দ্রব্যের কথা শুনতে পেয়ে ডাঃ সিমপ্‌সনও অস্ত্রচিকিৎসায় 'ইথার' ব্যবহার করতে লাগলেন। এতে চমৎকার ফল ফললো! তাঁর এ নতুন চিকিৎসার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু কেউ কেউ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জ্ঞাপন করলো। অনেকেই এটাকে ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ বলে ঘোষণা করলো। কেউবা এজন্য তাঁর বিচার চাইলো। কিন্তু সিমপ্‌সন তাদের কোন কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি বললেন, এদের মন কুসংস্কারে ভরা। এমন দিন নিশ্চয়ই আসবে যখন প্রতিবাদকারীদের দলে কেউই থাকবে না।

অস্ত্র চিকিৎসায় শুধুমাত্র 'ইথার' ব্যবহার করেই সিমপ্‌সন ক্ষান্ত রইলেন না। তিনি এর চেয়েও ভাল অন্য কোন অসাড়ক দ্রব্যের সন্ধান করতে লাগলেন। সে সময়ের আবিষ্কৃত প্রত্যেকটি রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে তিনি একটার পর একটা পরীক্ষাকার্য চালালেন। এগুলোর কোনটারই রাসায়নিক বা ব্যবহারিক গুণ তাঁর জানা ছিল না। কিন্তু প্রত্যেকটি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেন তিনি। নতুন কোন অসাড়ক দ্রব্যের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়ে প্রথমতঃ নিরুৎসাহ হলেন। তারপর পুনরায় তিনি আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠলেন। একদিন হঠাৎ স্কটল্যাণ্ড থেকে পাঠিয়ে দেওয়া ছোট্ট একটা শিশির কথা তাঁর মনে পড়লো। 'ক্লোরফর্ম' নামক এই রাসায়নিক দ্রব্যটির ব্যবহারিক গুণাবলী তখনও সবার অজ্ঞাত ছিল। এটি দীর্ঘদিন ধরে নিতান্ত অবহেলিত অবস্থায় সিমপ্‌সনের গবেষণাগারে পড়ে ছিল।

সেদিন ছিল ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর। সিমপ্‌সন একগাদা ফেল্‌না কাগজের স্তূপ থেকে বের করলেন 'ক্লোরফর্মের' শিশিটা। অন্যান্য দিনের ন্যায় সেদিনও তাঁর ডাক্তার বন্ধুগণ তাঁর গবেষণাগারে উপস্থিত ছিলেন। নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশে তাঁদের বৈঠক চলছিল। গল্প-গুজবের ফাঁকে ফাঁকে তাঁদের পরীক্ষাকার্যও চলছিল। এক সময় সিমপ্‌সন 'ক্লোরফর্মের' শিশি থেকে শোঁকবার যন্ত্রে কিছু পরিমাণ 'ক্লোরফর্ম' ঢাললেন এবং সবাই মিলে তা শুঁকতে লাগলেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁদের মনে হঠাৎ আনন্দের জোয়ার দেখা দিল। অভাবিত স্ফূর্তিতে তাঁরা একে অপরের সাথে কথা বললেন, ঠাট্টা-মস্করা করলেন—এ আনন্দ উচ্ছ্বাসের যেন শেষ নাই। তারপর আস্তে আস্তে তাঁদের গলার স্বর ভারী হয়ে এলো। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লেন সবাই। পৃথিবীটা যেন নিস্তেজ হয়ে এলো। কিছুক্ষণ পর সিমপ্সনই প্রথম ঘুম থেকে জাগলেন। চেতনা ফিরে পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, এতো দিনের অক্লান্ত পরিশ্রম আজ সার্থক হলো; যে অসাড়ক দ্রব্যের সন্ধানে তিনি দিন-রাত গবেষণা করছিলেন, এই সামান্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি তা' আবিষ্কার করলেন। মানুষকে অশেষ বেদনার হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার পথ খুঁজে পেলেন তিনি।

সিমপ্সন শীঘ্রই তাঁর আবিষ্কৃত নতুন অসাড়ক দ্রব্যটি অস্ত্রচিকিৎসায় ব্যবহার করলেন। এতে যাতনা-কাতর অসহায় রোগীরা অসহ্য বেদনার হাত থেকে মুক্তি পেল। হাসপাতালের অস্ত্রচিকিৎসাগারগুলো আর কসাইখানার সামিল রইলো না। দিকে দিকে তাঁর এ নতুন আবিষ্কারের কথা ছড়িয়ে পড়লো। সুনিপুণ অস্ত্রচিকিৎসক হিসেবে তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। তাঁর এ যশের জন্য মানবতার এই পরম বন্ধুটি করুণাময় আল্লাহতালার কাছে শোকরিয়া জানালেন।

ডাঃ সিমপ্সনের এ মহান আবিষ্কারের বিরুদ্ধেও একদল লোক প্রতিবাদ করলো। তারা এটাকে অধর্ম বলে প্রচার করতে লাগলো। তাদের দলে যোগ দিয়েছিল কিছুসংখ্যক হাতুড়ে ডাক্তার ও জন কয়েক গোঁড়া ধর্মবাদী। কিন্তু সিমপ্সনের খ্যাতি ও সাফল্যের কাছে তাদের এ প্রতিবাদের ঝড় ক্রমান্বয়ে ক্ষীণতর হয়ে এলো। দেশ-বিদেশের সবাই অস্ত্রোপচারকালে অসাড়ক দ্রব্যের ব্যবহার-বিধি মেনে নিতে লাগলো। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে রাজপুত্র লিওপোল্ডের জন্মের সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়া সিমপ্সনকে তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত করেছিলেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে সিমপ্‌সনের এ মহান আবিষ্কারের জন্য তাঁকে প্যারিসের মেডিকেল একাডেমির সদস্যভুক্ত করা হয়। তাঁর অমর অবদানের জন্য অন্যান্য দেশ থেকে মিলতে লাগলো সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। ইউরোপ ও আমেরিকার মেডিকেল একাডেমীসমূহেও তাঁকে সদস্যভুক্ত করা হয়। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের বিজ্ঞান একাডেমি তাঁকে 'মনথাইয়ন' পুরস্কারে সম্মানিত করে। তখনকার দিনে এই পুরস্কারের মূল্য ছিল দু' হাজার ফ্রাঙ্ক।

তাঁর এই মহান আবিষ্কারের পর সিমপ্‌সন দেশের বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসাবিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধনের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই ইউরোপের স্থানে স্থানে গড়ে উঠে মাতৃসদন হাসপাতাল। এই সময় তিনি অনেকগুলো মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এইসব প্রবন্ধের প্রত্যেকটিই ছিল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচিত। আজকের দিনের বহুল প্রচলিত ও চিকিৎসা-বিদ্যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এক্স-রে বা রঞ্জন রশ্মির আবিষ্কার সম্পর্কে তিনিই সর্বপ্রথম ইঙ্গিত দেন। সিমপ্‌সন তাঁর কোন এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'যদি বিদ্যুৎ ও অন্যান্য আলো একত্রিত করে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো যায় তবে এর বিভিন্ন অংশ স্পষ্ট ভাবে দেখা যেতে পারে। এতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডাক্তারদের প্রভূত সুবিধা হবে।'

চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই মহান সাধক তাঁর অমর অবদানের পর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। এই সময় তাঁর 'সবচেয়ে প্রিয় বড় ছেলের মৃত্যু হয়। এর মাসখানেক পরই তাঁর আদরের কন্যা জেসিকেও হারান তিনি। এমনিভাবে আঘাতের পর আঘাত তিনি আর সইতে পারলেন না। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল। দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি—কর্মক্ষমতা লোপ পেল। অবশেষে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ৬ই মে তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। যে ব্যক্তি ঘুমের মাধ্যমে মানুষের ভয়াল বেদনাকে জয় করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তিনি নিজেই ঘুমিয়ে পড়লেন—চির নিদ্রার কোলে নিজেকে সঁপে দিলেন।

ইংল্যাণ্ডের বহু কৃতি সন্তান ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবিতে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছেন। বৈজ্ঞানিক সিমপ্‌সনও তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর কবরের গায়ে আজও লেখা রয়েছে, 'যাঁর প্রতিভা ও মানব প্রীতির ফলে আজ গোটা জগৎ দৈহিক বেদনাবোধ দূর করবার জন্য 'ক্লোরফর্মের' ব্যবহার জানতে পেরেছে, গোটা মানব জাতি তাঁর জন্য চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ।'

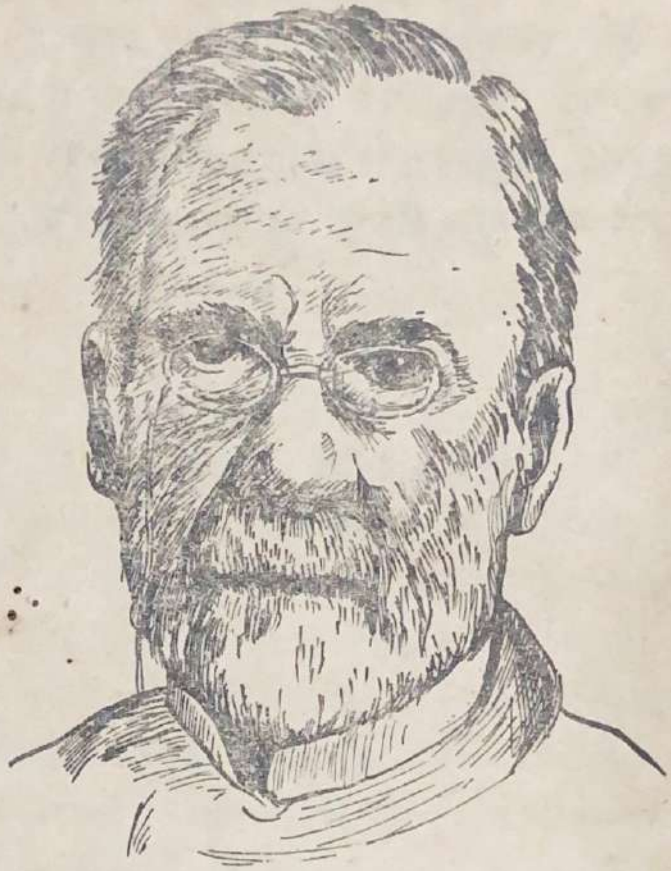

লুই পাস্তুর

প্যারিসের কোন এক হাসপাতালে একজন বৃদ্ধ লোক অধীর আগ্রহে সময় গুণছেন। প্রতিটি মুহূর্তই তাঁর কাছে অনেক মূল্যবান। জলাতঙ্ক রোগগ্রস্থ একটি কৃষাণ বালকের শয্যাপাশে দণ্ডায়মান তিনি। আশা নিরাশার টানা-পোড়েনে তাঁর মন দুলছে। তিনি ভাবছেন, তাঁর এ পরীক্ষার ফলাফল সত্যিই কি বিফলে যাবে? বিশ্বমানবতা কি রোগ শোকের হাত থেকে পাবে না মুক্তি? মানুষ আর কত দিন এই রোগের ভয়াল দৃশ্যকে নিয়তির পরিহাস বলে মেনে নিবে? এ অসহ্য যাতনার কি শেষ নেই! এমনি আরও কত শত প্রশ্ন তাঁর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। অযুত প্রশ্নবানে জর্জরিত এ বুড়োর চোখে ঘুম নেই; আজ দিন পনের থেকে

খাওয়া-নাওয়া তিনি ভুলেছেন। রোগীর পাশেই অধীর আগ্রহে কেটেছে বিনিদ্র প্রতিটি মুহূর্তে।

মানবতার এই দরদী বন্ধুটির নাম লুই পাস্তর। ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে ফ্রান্সের ডোল নামক স্থানে তাঁর জন্ম। পাস্তরের পিতার একটা চামড়া পাকা করার কারখানা ছিল। তিনি একজন প্রকৃত দেশ-প্রেমিক ছিলেন। প্রথম নেপলিয়ানের তৃতীয় পল্টনের তিনি একজন দুর্ধর্ষ সৈনিক ছিলেন। দেশ সেবাই ছিল তাঁর মহান ব্রত। তাই তিনি পাস্তরকে ছোটবেলা থেকেই দেশপ্রেমের গল্প শুনাতেন এবং সব সময়ই একজন খাঁটি নাগরিক হওয়ার সদুপদেশ দিতেন।

পাস্তরের পিতা পাস্তরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ছোট ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে-তিনি কিছুতেই স্থির থাকতে পারতেন না। তাই পাস্তরকে বাড়ীতে বসেই লেখাপড়া করতে হতো। যখন তাঁর বয়স ষোল বছর, তখন তিনি প্রথম কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু পাস্তর সে কলেজে বেশী দিন টিঁকতে পারেননি। বাড়ীর জন্য তাঁর মন সব সময়ই ছট্‌ফট্‌ করতো। তিনি নিজেকে বড় একাকী মনে করতেন; এতে শীঘ্রই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। কলেজ ছেড়ে বাড়ীতে ফিরে আসতে বাধ্য হন তিনি।

ছোটবেলায় পাস্তর তাঁদের গ্রামের আশে-পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে একাকী ঘুরে ঘুরে তিনি এসব দৃশ্য অবলোকন করতেন। এবং তা' চিরদিনের জন্য ধরে রাখার অভিপ্রায়ে তুলি দিয়ে এসবের ছবি আঁকতেন। ছবি আঁকায় তাঁর দক্ষতা ছিল অনেক। তিনি তাঁর মা-বাবা ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের অনেকগুলো ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর প্রত্যেকটি ছবিই ছিল উঁচু মানের।

১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে লুই পাস্তর পুনরায় কলেজে ভর্তি হলেন। প্যারীর একোল নর্মাল কলেজ থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এই কলেজে তিনি ছিলেন রীতিমত একজন ভাল ছাত্র। এখানে রসায়নবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা করতেন তিনি। অধ্যাপকগণ তাঁর অসাধারণ মেধার পরিচয়

পেয়ে সবাই তাঁকে ভালবাসতেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর কাণ্ড-কারখানা দেখে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়তেন। তাঁরা প্রায়ই লক্ষ্য করতেন, রসায়নবিদ্যার ছাত্র হয়েও পাস্তুর অবসর সময়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে ছোট ছোট জীবদের নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন।

এই সময় জে. বি. ডুমা ছিলেন প্যারির একজন নামকরা বৈজ্ঞানিক। লুই পাস্তুর কিছুদিনের জন্য ডুমার অধীনে রসায়নবিদ্যা চর্চা করেন। বৈজ্ঞানিক ডুমার অসাধারণ বাগ্মিতা ও তাঁর জ্ঞানের গভীরতা শীঘ্রই লুই পাস্তুরকে মুগ্ধ করলো। তাঁর কাছ থেকে পাস্তুর পেলেন গবেষণা করার নতুন প্রেরণা। এ থেকেই পরবর্তীকালে তিনি ভাবতে শিখেছিলেন, গবেষণা পরিচালনার জন্য সারাদিনের এ সময়টুকু মোটেও পর্যাপ্ত নয়। তাই তিনি অধিক রাত পর্যন্ত গবেষণাগারে কাটিয়ে দিতেন।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লুই পাস্তুর ডিয়নে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়। কিন্তু অতি শীঘ্রই তিনি স্ট্রাস্‌বুর্গে রসায়নবিদ্যায় অধ্যাপক পদের আমন্ত্রণ পেয়ে ডিয়ন ত্যাগ করেন। এই সময় তিনি স্ট্রাস্‌বুর্গে টারটারিক এসিড নামক এক প্রকার জৈব রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। বিভিন্ন অবস্থায় এই এসিডের আলোকী গুণাবলীর কথা তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন। এটি তাঁর একটি মৌলিক গবেষণা। এরূপ অভিনব আবিষ্কারের জন্য পাস্তুরের সাথে অধ্যাপক জে. বি. বয়টের অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠে। বয়ট ছিলেন সে-যুগের একজন বিখ্যাত রসায়নবিদ। তিনি আলোক সমাবর্তনের তথ্য নিয়ে গবেষণা করছিলেন। পাস্তুরের আবিষ্কারের ফলে তাঁর সে তথ্য পূর্ণতা লাভ করে। তাই তিনি সেদিন পাস্তুরকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করেছিলেন। এখানে অল্পদিনের মধ্যেই একাডেমীর রেক্টর এম. লুরেণ্টের সাথে পাস্তুরের পরিচয় হয় এবং ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে মে তারিখে তিনি লুরেণ্টের কন্যা মেরী লুরেণ্টকে বিবাহ করেন।

লুই পাস্তুর সব সময় গবেষণা কাজে ডুবে থাকতে ভালবাসতেন। পরীক্ষাগারে থাকাকালীন তিনি বাইরের পৃথিবীর কথা প্রায়ই ভুলে যেতেন। এখানকার চারি দেওয়ালের বাইরে কি ঘটছে তা' তিনি কখনই লক্ষ্য

করতেন না। স্ট্রাসবুর্গে থাকাকালীন একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটে। সেদিন স্ট্রাসবুর্গে দেশের প্রেসিডেন্টের সফরে আসার কথা ছিল। চারদিকে মহাসমারোহে ধুমধাম চলছিল। প্রেসিডেণ্টকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। কথা ছিল মেরীকে সাথে নিয়ে লুই পাস্তুরও সে অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন। সময়মত ফেরবার কথা বলে পাস্তুর তাঁর গবেষণাগারে প্রবেশ করলেন। ভোর বেলা থেকে একটার পর একটা পরীক্ষা নিয়ে মেতে রইলেন তিনি। এদিকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো; অনুষ্ঠান শেষে সব মানুষ ঘরে ফিরলো—কিন্তু তবুও লুই পাস্তুরের দেখা মিললো না। বহুক্ষণ প্রতীক্ষায় ছট্‌ফট্ করলেন মেরী লুরেণ্ট। তারপর অনুষ্ঠানে যাওয়ার আশা পরিত্যাগ করে পাস্তুরের ফেরার পথে চেয়ে রইলেন। সন্ধ্যার পর ক্লান্ত শরীরে বাড়ী ফিরলেন পাস্তুর। মেরী লুরেণ্টের মুখে অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা শুনেই তিনি বললেন, 'তাই তো, বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে। আমি ত' বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম।' ভুলের জন্য নিজেকে বারবার দোষারোপ করলেন; তারপর বললেন,—'কাজ একবার শুরু করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যও তা' ছাড়তে ইচ্ছা করে না।'

পাস্তুর সব সময় নিবিষ্ট মনে একাকী গবেষণাগারে কাজ করতে ভালবাসতেন। একটানা পরীক্ষাকার্যে কখনও কোথাও সামান্যতম বাধা পেলে তিনি বেশ মনঃকষ্ট পেতেন। বাইরের ঝামেলা তিনি একদম পছন্দ করতেন না। এমনকি সভা-সমিতির ধারও ধারতেন না। একাডেমী কিংবা অন্যান্য সমিতির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি এসবের সভাতে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকতেন।

১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে পাস্তুরকে লিলিতে অধ্যাপকের পদ প্রদান করা হয় এবং তাঁকে বিজ্ঞান বিভাগের ডীন নিযুক্ত করা হয়। ইতিমধ্যেই ভাল শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে চারদিকে সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশ-বিদেশের ছাত্রগণ তার বক্তৃতা শুনার অভিপ্রায়ে ভীড় জমাতে লাগলো। তিনি ছাত্রগণকে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য উপদেশ দিতেন। তা'ছাড়া তিনি

বলতেন, শুধুমাত্র বিজ্ঞানের আনন্দেই গবেষণা করলে চলবে না, বরং প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বাস্তব প্রয়োগ থাকা বাঞ্ছনীয়। লিলিতে তিনি তিন বছর অবস্থানের পর একোল নর্মাল কলেজে চলে আসেন।

পাস্তুরের লিলিতে অবস্থানকালে হঠাৎ একবার মদ চোলাই-এর কারখানায় এক বড় রকমের বিপত্তি দেখা গেল। এই বিপত্তি নিরসনের জন্য কারখানার মালিকগণ বহু অর্থ ব্যয় করেও তা' নিষ্পত্তি করতে পারলো না। অবশেষে তারা একরূপ নিরাশ মনেই লুই পাস্তরেব শরণাপন্ন হলো। পাস্তরও তাদের এ করুন আবেদনে সাড়া দিলেন। কারখানায় গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, মদ চোলাইয়ের জন্য এরা যে-সব বড় বড় কড়াই ব্যবহার করে তাদের কোন কোনটির মধ্যে ভাল মদ প্রস্তুত হয়েছে আর কোন কোনটির মদ টক্ হয়ে গেছে বা খারাপ হয়েছে। তৎক্ষণাৎ এর কারণ সম্বন্ধে কোন কিছু বলতে তিনি সক্ষম হলেন না।

নানা রকমের রাসায়নিক পরীক্ষাকার্য চালালেন। তারপর হঠাৎ একদিন একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে নষ্ট হওয়া কড়াইয়ের মদ নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। এতে তিনি লক্ষ্য করলেন, আমাদের দৃষ্টির অগোচরে যে-সব ক্ষুদে প্রাণী রয়েছে তাদেরই একদল মদ চোলাইয়ের কারখানায় এ অঘটন ঘটাচ্ছে। তিনি বললেন যে, এইসব ক্ষুদে প্রাণীর গা থেকে এক প্রকার রস বেড়িয়ে এসে কড়াইয়ের সমস্ত জিনিসকে নষ্ট করে দিচ্ছে। পাস্তর এই ক্ষুদে প্রাণীদের নাম দিলেন ল্যাক্টিক এসিড ব্যাক্টেরিয়া। ব্যাক্টেরিয়া শব্দের অর্থ জীবাণু। তিনি আরও বললেন, আমাদের ঘরে যে দুধ টকে যায়, খাবার পচে যায়, এগুলোরও মূলে রয়েছে নানা প্রকার জীবাণু। দৃষ্টির অগোচরে এদের বাস। পাস্তরের এ আবিষ্কারের কথা সাথে সাথেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা শুনে জগৎ বিস্মিত হলো।

পাস্তরের এ আবিষ্কারের ফলাফলকে মানুষের রোগ-শোক নিবারণের কাজে ব্যবহার করেছেন অপর একজন বৈজ্ঞানিক—লর্ড জোসেফ বেরন

লিস্টার তাঁর নাম। এই সময় ইংল্যাণ্ডের হাসপাতালগুলোতে অস্ত্রোপচারের পর ক্ষতস্থান পচে গিয়ে রোগীর মৃত্যু সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলছিল। বহু দিন থেকেই লিস্টার তা' রোধ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। তিনি পাস্তুরের আবিষ্কারের কথা শুনে ভাবলেন, নিশ্চয়ই ক্ষতস্থানকে পচিয়ে তোলাও এইসব জীবাণুদেরই কাজ। তাই তিনি মানুষের ক্ষতস্থানকে জীবাণু-শূন্য করার বিধি আবিষ্কারের প্রতি মনযোগী হলেন এবং পচন-নিবারক দ্রব্য কার্বলিক এসিডের নতুন ব্যবহার পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। তাঁর এ আবিষ্কারের ফলে মৃত্যুর হাত থেকে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ ফিরে পেল।

মানুষের আদর্শ খাদ্য দুধ প্রায়ই টকে যায় এবং তা নষ্ট হয়। এমনিভাবে দুধ টকে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য পাস্তুর একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। তাঁর এ পদ্ধতির আজও বহুল প্রচলন রয়েছে। তিনি এতে বলেছেন, দুধকে একবার জীবাণুমুক্ত করে কোন একটি জীবাণুশূন্য বদ্ধ পাত্রে রাখলে তা' আর টকে যায় না বা নষ্ট হয় না। জীবাণু ধ্বংসের জন্য তাড়াতাড়ি দুধ গরম ও ঠাণ্ডা করার যে নতুন পদ্ধতিটি তিনি আবিষ্কার করেন তা' 'পাস্তুরীকরণ' বলে আজও পরিচিত। লুই পাস্তুরের নামানুসারেই পদ্ধতিটির এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

দেশ-দেশান্তরে অনেক আগে থেকেই পাস্তুরের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। বড় বড় ব্যবসায়ীদের মতে, জাতীয় এতোবড় ত্রাণকর্তা সে-যুগে আর কেউ ছিল না। যাদের দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল তাদের মতে খোদার কৃপায় পাস্তুর ও লিস্টারের সাহায্যেই তারা জীবন ফিরে পেয়েছে। কারখানা মালিকদের কথায়, এঁর ন্যায় এতোবড় উপকারী বন্ধু কদাচিৎ মিলে থাকে।

১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের কথা। এই সময় একবার ফ্রান্সের রেশম শিল্প প্রায় ধ্বংস হতে চলেছিল। রেশম পোকার মধ্যে এক প্রকার রোগ দেখা দিয়েছিল। পোকা বিশারদগণ কিছুতেই তা' রোধ করার কোন পথ বাতলে দিতে পারলেন না। একদম নিরূপায় হয়ে ফরাসী সরকার লুই পাস্তুরের স্মরণাপন্ন হলেন। এদিকে পাস্তুর পড়লেন মহামুস্কিলে; এর পূর্বে তিনি

কখনও রেশম পোকাই দেখেননি। তবুও তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এ নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। তিনি পণ করলেন—যেমন করেই হোক দেশের এতো বড় শিল্পকে রক্ষা করতেই হবে। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করলেন। রেশম পোকার তিনি এক প্রকার অনিষ্টকারী জীবাণুর সন্ধান পেলেন। এরাই রোগ সৃষ্টির মূল কারণ। লুই পাস্তুর এদের হাত থেকে রেশম শিল্পকে রক্ষার জন্য এক প্রকার ঔষধও বাতলে দিলেন। ফলে, ফ্রান্সের ধ্বংস-প্রায় রেশম শিল্প রক্ষা পেল।

এর কিছুদিন পর লুই পাস্তুর আংশিক পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হলেন। তিনি ভাবলেন, এখনও ত' সব কাজই বাকী রয়ে গেছে, তার আগেই কি তাঁকে পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিতে হবে? বিশ্ববাসী পাস্তুরের এ রোগের কথা শুনে মর্মাহত হলো। তারা সবাই তাঁর রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করলো; তারা কিছুতেই তাদের এতোবড় একজন উপকারী বন্ধুকে হারাতে নারাজ। শীঘ্রই তাদের সমবেত প্রার্থনা কাজে লাগলো—পাস্তুর ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করলেন। পুনরায় তিনি সুস্থ দেহে গবেষণাগারে প্রবেশ করলেন।

ছোটবেলায় দেশকে ভালবাসার যে শিক্ষা তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন, আজীবন পাস্তুর তা' কখনও ভুলতে পারেননি। পিতার প্রতিটি কথাই তাঁর মরমে মরমে গাঁথা ছিল। দেশের জন্য জীবন-পাত করতেও তাঁর কখনও কুণ্ঠা ছিল না। সৈনিক পিতার যোগ্য ছেলে ছিলেন তিনি। তাই ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার মধ্যে একবার যখন যুদ্ধ লাগে তখন তিনি সৈনিকের খাতায় নাম লেখানোর জন্য তাড়াতাড়ি হাজির হলেন। কিন্তু এতে বাধ সাধলো তাঁর ওই পক্ষাঘাত রোগ। তিনি ডাক্তারী পরীক্ষায় বাদ পড়লেন। দুঃখে তাঁর মন ভারাক্রান্ত হলো। পরিশেষে দেশরক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য হাসিমুখে তিনি তাঁর এক ছেলেকে সৈন্য দলে পাঠিয়ে দিলেন।

যুদ্ধ থামলো। পাস্তুর নয়া উদ্যমে পুনরায় জীবাণুতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা

শুরু করলেন। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে দেশসেবার মহান সঙ্কল্পকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কাজে ব্রতী হলেন। এই সময় তাঁর অমর কৃতিত্বের জন্য তাঁকে প্যারিসের বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য নির্বাচিত করা হয়। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্যারিসের মেডিকেল একাডেমীরও সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জীবাণুতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে পাস্তুর সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলেন। কেননা, ডাক্তারী বিদ্যা তাঁর জানা ছিল না। এই সময় তিনি দিনরাত পরিশ্রম করে তাঁর দু'জন ছাত্রের কাছে ডাক্তারি বিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে লাগলেন। জ্ঞান আহরণের জন্য তাঁর মন সব সময়ই দ্বিধামুক্ত ছিল। মিথ্যা মান-সম্মানের ভয়ে তিনি কখনই আড়ষ্ট ছিলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর ছাত্রদের কাছ থেকে ডাক্তারি বিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলেন।

এই সময় একবার ফ্রান্সের গৃহপালিত পশু, বিশেষ করে ভেড়ার পালে মড়ক লাগে। পশুপালকগণ পড়লো মহাবিপদে। এ মড়কে তাদের পালশুদ্ধ পশু উজাড় হতে চললো। এন্‌থ্রাকস্ নামক এক প্রকার রোগই এর জন্য দায়ী। এ-রোগ সারাবার অন্য কোন উপায়ন্তর না দেখে তারা মহামান্য লুই পাস্তুরের শরণাপন্ন হলো। তাদের জানা ছিল, পাস্তুরই ফ্রান্সের রেশম শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন পাস্তুর পশুপালকগণকে বিমুখ করলেন না। তিনি দেখলেন, এত বড় মড়ক রোধ করতে না পারলে দেশের প্রভূত ক্ষতি হবে—এক কথায় দেশ থেকে গৃহপালিত পশু লোপ পাবে। তাই তিনি এন্‌থ্রাকস্ রোগ দমনের জন্য দিন-রাত গবেষণা করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এ-রোগের জন্য দায়ী এক প্রকার রোগ জীবাণু সহজেই পৃথক করতে সমর্থ হলেন। তিনি এই রোগ জীবাণু সুস্থ পশুর শরীরে প্রবেশ করিয়ে এন্‌থ্রাকসের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করলেন। সবাই বললো, এটি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে একটি যুগান্তরকারী আবিষ্কার। জেনার

নামক একজন বৈজ্ঞানিক প্রথম এই সূত্র অনুযায়ী বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হিসেবে টীকা আবিষ্কার করেন। লুই পাস্তুর মোরগের কলেরা রোগের প্রতিষেধকও আবিষ্কার করেছিলেন।

এনথ্রাকস্ রোগের চিকিৎসা প্রণালী উদ্ভাবনের ফলে ১৮৮৪ সাল থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত মোট দশ বছর সময়ে ফ্রান্সে ৩৪,০০,০০০ ভেড়া এবং ৪,৩৮,০০০ গৃহপালিত পশুকে প্রতিষেধক ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়। এতে আশাতীতরূপে পশুমৃত্যুর হার কমে যায়।

শীঘ্রই অপর একটি মারাত্মক ব্যাধির চিকিৎসার প্রতি লুই পাস্তুরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। তখনকার দিনে লোকে পাগলা কুকুরের নাম শুনলেই আঁতকে উঠতো; মরি কি বাঁচি বলে ছুটে পালাতো। এর কামড় থেকে ভয়ঙ্কর জলাতঙ্ক রোগের সৃষ্টি হয়। এটা এনথ্রাক্স রোগ অপেক্ষাও ভয়াবহ। পাগলা কুকুর কামড়ানোর সাথে সাথে রোগের কোন লক্ষণ দেখা যেত না। কিন্তু এক সপ্তাহ পরেই রোগের ভয়াবহতা দেখা দিত। প্রথমতঃ, মানসিক দিক থেকে রোগী নেতিয়ে পড়তো, তারপর অত্যধিক বক্র বক্র শব্দ করতো এবং তার অস্থিসন্ধি ফুলে যেত। রোগীর পানি পিপাসা সাংঘাতিকরূপে বেড়ে যেত, অথচ পানি দেখলেই ভীত হয়ে পড়তো। এমনিভাবে দু'তিন দিন গত হওয়ার পর সে শ্বাসরোধের প্রবল প্রকোপে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো।

মানবতার এই কষ্ট দেখে লুই পাস্তুরের মন কেঁদে উঠলো। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি জলাতঙ্ক রোগের এক প্রকার প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কার করলেন। তাঁর এই আবিষ্কারের পদ্ধতি ছিল বড় মজার। এতে তিনি প্রথমতঃ, কতকগুলো সুস্থ সবল গিনিপিগের শরীরে জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু প্রবেশ করালেন। তারপর, এদের সুষুম্নাকাণ্ড থেকে এক প্রকার প্রতিষেধক ঔষধ আহরণ করলেন। এটাই জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক ঔষধ। এই ঔষধ আবিষ্কারের সাথে সাথে পাস্তুর একথা বলে দিলেন যে এইসব প্রতিষেধক ঔষধ বাতাসের সংস্পর্শে এলেই এদের কর্মক্ষমতা নষ্ট হয় কিংবা হ্রাস পায়।

পাস্তুরের এ অমর আবিষ্কারের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে দেশ-দেশান্তরে তাঁর নাম আলোচিত হলো—সবাই এ মহান আবিষ্কারের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানালো। পাস্তুর পাগলা কুকুরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ঔষধ আবিষ্কার করলেও তখন পর্যন্ত তিনি তা' মানবদেহে পরীক্ষা করেননি। শীঘ্রই সে দিনটি ঘনিয়ে এলো। কোন এক নগরের মেয়র তাঁর কাছে কুকুরে কামড়ানো এক রাখাল বালককে পাঠালেন। পাস্তুরের উপর একে রোগমুক্ত করার ভার ন্যস্ত হলো। বিনা বাক্যব্যয়ে পাস্তুর তাঁর আবিষ্কৃত নতুন ঔষধটি প্রয়োগ করলেন। রাখাল বালকটি অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলো এবং এর সাথে সাথে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে একটি নতুন বিজয় সূচিত হলো। লুই পাস্তুরের এই মহান সাফল্যকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্য সে সময় প্যারিসে ওই বালকটির একটি প্রস্তরমূর্তি নির্মিত হয়েছিল। পাস্তুরের এ বিজয়ের ফলাফল থেকে পরবর্তীকালে অনেক বড় বড় আবিষ্কারেরই অনুপ্রেরণা পাওয়া সম্ভব হয়েছিল; এদের মধ্যে ধনুষ্টঙ্কার, কলেরা, ডিপ্‌থেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ বিজয়ের কথা উল্লেখযোগ্য।

চৌষট্টিতম জন্মবার্ষিকীতে জলাতঙ্ক রোগের ঔষধ আবিষ্কারের জন্য লুই পাস্তুরকে জিন রেনার্ড পুরস্কার দেওয়া হয় এবং বিশ্বমানবতার এই মানব দরদী বন্ধুর নামে একটি গবেষণাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। লুই পাস্তুরের নামানুসারেই 'পাস্তুর ইনসটিটিউট' নামে গবেষণাগারটির নামকরণ করা হয়। প্যারিসের বুকে আজও এটি লুই পাস্তুরের স্মৃতিকে অম্লান করে রেখেছে। প্রতি বছর এখানে দেশ বিদেশের গবেষকদের ভীড় হয়। লুই পাস্তুর এই গবেষণাগারে সুদীর্ঘ সাত বছর গবেষণা করেছিলেন।

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে সেন্ট ক্লাউডে এতোবড় মনীষী, শান্তির মহান সাধক ও মানব প্রেমিকের মৃত্যু হয়। তাঁর অমর আবিষ্কারের জন্য বিশ্বের মানুষ যুগ যুগ ধরে তাঁর নাম স্মরণ করবে। পৃথিবীর বুক থেকে সমগ্র মানব জাতি ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত পাস্তুরের নাম অমর হয়ে থাকবে। তিনি আজীবন অনাড়ম্বর, সাদাসিদে, স্নেহপ্রবণ ও কঠোর পরিশ্রমে বিশ্বাসী ছিলেন।

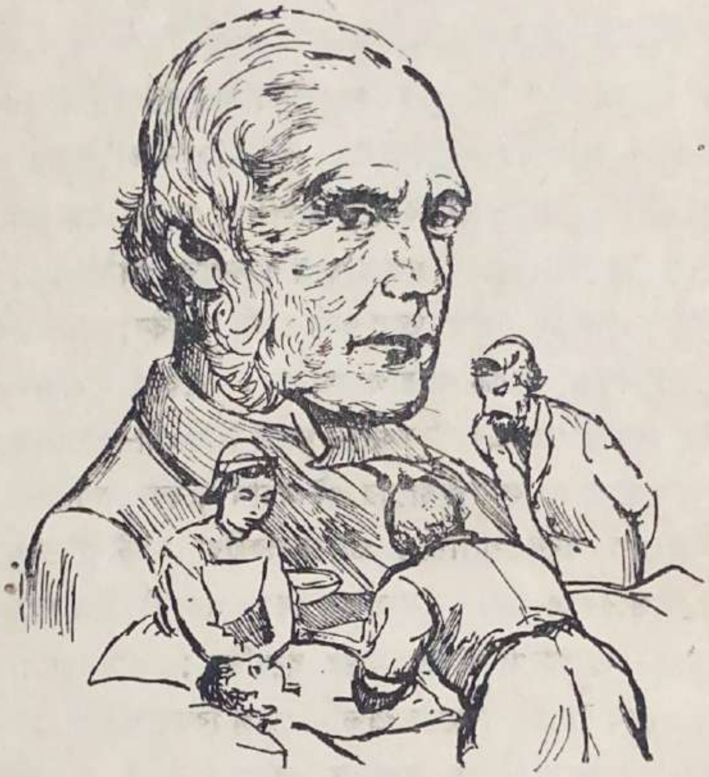

লর্ড লিস্টার

বর্তমান যুগ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ। এ-যুগে আবিষ্কৃত হয়েছে বহু নতুন নতুন ঔষধ, অস্ত্র চিকিৎসা প্রভৃত উন্নতি লাভ করেছে, মানুষ ভুলেছে ব্যথা-বেদনা, বিজিত হয়েছে বহু দুরারোগ্য রোগের প্রচণ্ড প্রকোপ, এক কথায়, রোগ-শোক বিদায় নিতে চলেছে। আজকে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই জানতে পেরেছি রোগ কেন হয়, আর তা' থেকে নিরাময়ের সুনির্দিষ্ট পথ। বর্তমান কালের হাসপাতালগুলো আর কসাইখানার সামিল নয়, এখানে অজস্র মৃতপ্রায় রোগী সুস্থতা ফিরে পাচ্ছে। ফলে, মানুষের আয়ুষ্কালও বেড়ে চলেছে।

কিন্তু মাত্র একশ' বছর আগেও গোটা পৃথিবীর অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ। তখন চিকিৎসা-বিজ্ঞান মোটেও উন্নত ছিল না। হাসপাতালগুলোতে

লোকের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। মাঝে মাঝে এর সংখ্যা এত বেশী হতো যে তা' দেখে ডাক্তারদের বুক পর্যন্ত ভয়ে কেঁপে উঠতো।' রোগের অসহ্য যন্ত্রণা আর অসংখ্য মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য অনেকেরই মন ছট্‌ফট্ করতো; কিন্তু তাঁরা ছিলেন নিরুপায়। তখন পর্যন্ত আস্ত্রোপচারের পূর্বে রোগীকে সংজ্ঞাহীন করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি।

সিমপ্‌সন নামক একজন বৈজ্ঞানিক একদিন ঘোষণা করলেন যে 'ক্লোরোফর্ম' নামক এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে আস্ত্রোপচারের পূর্বে রোগীকে অজ্ঞান করা সম্ভব। এতে মানুষ অস্ত্রোপচারের যন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা পাবে। কেননা সে সময় চেতনা থাকতেই রোগীর শরীরে আস্ত্রোপচার করা হত। সিমপ্‌সনের এই আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক নতুন বিপ্লব সূচিত হলো। অস্ত্রোপচারের যাতনার হাত থেকে মুক্তির উপায় উদ্ভাবনে মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

কিন্তু তবুও একটা বিপত্তি রয়ে গেল। হাসপাতালে দেখা যেতে লাগলো, আস্ত্রোপচারের পর ক্ষতস্থান দূষিত হয়ে রোগীরা অসহ্য যাতনায় মারা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ব্যাপারটা মড়কের পর্যায়ে দাঁড়ালো। বড় বড় ডাক্তাররা এ নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন; এবং তাঁদের মধ্যে একজন এ ব্যাপারে সফলকাম হলেন। তিনি ক্ষতস্থানকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করার ঔষধ আবিষ্কার করলেন। তাঁর আবিষ্কার চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আনলো আমূল পরিবর্তন। তাই তাঁর নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। এই অমর বৈজ্ঞানিকই হলেন জোসেফ বেরন লিস্টার।

১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখে ইংল্যাণ্ডের এসেক্স শহরে জোসেফ বেরন লিস্টার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জোসেফ জ্যাকসন্ লিস্টার। অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য তিনি রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ছোট বেলায় লিস্টার তাঁর পিতার কাছে ঘরে বসেই লেখা-পড়া শিখতেন। পিতার বড় আদরের ছেলে ছিলেন

তিনি তাই বড় হয়েও লিস্টার তাঁর গবেষণার খুঁটিনাটি সব সময়ই পিতাকে লিখে জানাতেন। এতে তাঁর পিতা যেমন আনন্দ পেতেন অনেক, তেমনি গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠতো।

১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে বেরন লিস্টার ডাক্তারী পড়ার জন্য লণ্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে পাশ করার পর তিনি এডিনবরায় যান। এডিনবরা ছিল তখনকার দিনে ডাক্তারী শিক্ষার তীর্থক্ষেত্র। দেশের প্রায় সব বড় বড় ডাক্তারই এখানে শিক্ষকতা করতেন। এদের মধ্যে ডাঃ সয়মের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক। বেরন লিস্টার এডিনবরায় ডাঃ সয়মের সহকারী হিসেবে কাজে যোগদান করেন।

ডাঃ সয়ম ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির লোক। কাজ কামই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান-ধারণা, কাজের লোক ছাড়া কাউকেই তিনি ভালবাসতেন না। তরুণ লিস্টারও ডাঃ সয়মের সাহচর্যে দিন-রাত কাজ করতেন। ফলে, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ডাঃ সয়মের প্রিয়পাত্র হলেন এবং ডাঃ সয়ম খুশী হয়ে লিস্টারকে হাউস্ সার্জনের পদে নিযুক্ত করলেন। এরপর প্রতিটি অস্ত্রোপচারের কাজে লিস্টার তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করলেন।

একবার একটা কঠিন অস্ত্রোপচারের কাজ লিস্টারকেই করতে হয়েছিল। ডাঃ সয়ম ছিলেন তাঁর পাশে। রোগীটির ঘাড়ে ছুরিকাঘাত ছিল। ক্ষত স্থান দিয়ে অধিক রক্ত ক্ষরণের ফলে সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। রোগীর এরূপ অবস্থা দেখে লিস্টার প্রথমতঃ ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেল; তথাপি তিনি মনোবল হারালেন না। রোগীকে প্রথমতঃ অজ্ঞান করে অস্ত্রোপচারে হাত দিলেন। সুনিপুণভাবে তিনি কাজ সমাধা করলেন; অস্ত্রোপচার সফল হলো।

লিস্টারের এরূপ দক্ষতা দেখে ডাঃ সয়ম মুগ্ধ হলেন। তাঁর পরিবারের সাথে লিস্টারের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেল। লিস্টার ডাঃ সয়মের প্রথমা কন্যা এগ্নেসের সাথে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে বিবাহ বন্ধনে

আবদ্ধ হলেন। লিস্টার প্রায় সময়ই তাঁর গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন; তাই তিনি গবেষণার ফলাফল লেখার সময় পেতেন কম। এগ্‌নেস ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে লিস্টারের বক্তব্য টুকে তাঁকে সাহায্য করতেন। এ কথা সত্য যে, এগ্‌নেস না থাকলে আমরা হয়ত' লিস্টারের মূল্যবান বক্তব্যসমূহ থেকে বঞ্চিত হতাম।

লিস্টার একজন দক্ষ অস্ত্র-চিকিৎসক ছিলেন। একবার তিনি লক্ষ্য করলেন যে, অস্ত্রোপচারে তাঁর এতো দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই রোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। অস্ত্র-চিকিৎসার পর ক্ষতস্থান দূষিত হয়ে লোক মরছে। ক্রমান্বয়ে এ মৃত্যুর সংখ্যা অনেকগুণে বৃদ্ধি পেল। হাসপাতাল বন্ধের দাবীতে জনমত গড়ে উঠতে লাগলো। লিস্টার পড়লেন মহা-মুস্কিলে, একটা কিছু উপায় উদ্ভাবন না করলেই নয়। তিনি দিন-রাত এ নিয়ে গবেষণা করলেন। তাঁর গবেষণার ফলাফল আলোচনা করে একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে রয়াল সোসাইটিতে পাঠালেন। এতে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচয় পেয়ে সোসাইটির অন্যান্য সদস্যরা তাঁকে রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত করলেন।

লিস্টার ভাবলেন, ক্ষতস্থান দূষিত হওয়ার মূলেই রয়েছে এর ভিতরের পুঁজ! তাঁর মতে, ক্ষতস্থানের মাংস পচে পুঁজের সৃষ্টি হয়। এর অধিক কিছু বলতে তিনি সক্ষম হননি। গবেষণায় মত্ত রইলেন তিনি। এমন সময় একদিন তিনি ইংলিশ চ্যানেলের ওপার থেকে কার যেন কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। ফ্রান্সের মাটি থেকে পাস্তুর নামক একজন বৈজ্ঞানিক বললেন, "আমাদের দৃষ্টির বাইরে বাতাসে অসংখ্য সব জীবাণু আছে, যারা জিনিসকে পচিয়ে তোলে, দুধকে টক করে।"

লুই পাস্তুরের এ মতবাদ তিনি মেনে নিলেন। তারপর ভাবলেন, অস্ত্রোপচারের সময় সম্পূর্ণ ঘরের আবহাওয়াকে জীবাণুমুক্ত রাখা ত' বেশ কঠিন কাজ; তাছাড়া অতি কষ্টে একবার জীবাণুমুক্ত করলেও পরক্ষণেই তা' দূষিত হবে। তাই তিনি শুধুমাত্র ক্ষতস্থানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন।

কি করে জীবাণুদের আক্রমণ থেকে ক্ষতস্থানকে রক্ষা করা যায়, তাই নিয়ে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন।

এরপর লিস্টার একটার পর একটা পরীক্ষাকার্য চালালেন। একদিন তিনি ক্ষতস্থানে কার্বলিক এসিডে ভেজানো একটা পট্টি বাঁধলেন, এতে বেশ সুফলও পেলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, এর ফলে পচন সৃষ্টিকারী জীবাণুগুলো ধ্বংস হয়, এমন কি নতুন জীবাণুও আর বাসা বাঁধতে পারে না। লিস্টারের এ আবিষ্কারে শীঘ্রই কার্বলিক এসিড একটা শক্তিশালী জীবাণু প্রতিরোধক ঔষধ হিসেবে পরিগণিত হলো। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে লিস্টার সর্বপ্রথম অস্ত্র-চিকিৎসার ক্ষেত্রে কার্বলিক এসিড প্রয়োগ করেন। তাঁর চিকিৎসার ফলে এক কঠিন হাতভাঙ্গা রোগী সম্পূর্ণ সেরে উঠে। এই সাফল্যের পর, লিস্টার তাঁর আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন।

প্রতিষেধক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আমূল পরিবর্তন সূচিত হলো, শত শত রোগী ফিরে পেতে লাগলো তাদের সুস্থ জীবন। বৈজ্ঞানিক সিম্পসন মানুষকে অস্ত্রোপচারের যাতনা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন আর বৈজ্ঞানিক লিস্টার মানুষকে অকাল ও তিলে তিলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন। তাঁর এ আবিষ্কারের জন্য সমগ্র বিশ্ববাসী তাঁকে অভিবাদন জানালো।

চারদিকে লিস্টারের সুনাম ছড়িয়ে পড়লো। যেদিকে তাকালেন সেদিকেই দেখতে পেলেন—অজস্র জনতা তাঁকে স্বাগতম জানাচ্ছে। এতে তিনি বিপুল উৎসাহ পেলেন। দ্বিগুণ উদ্যমে আরও গবেষণা চালিয়ে গেলেন। ফলে আবিষ্কার করলেন অস্ত্র-চিকিৎসায় নতুন নতুন পদ্ধতি। প্রথমতঃ ক্ষতস্থানকে জীবাণুশূন্য করলেন, তারপর অস্ত্রোপচারের জন্য ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতিকেও জীবাণুমুক্ত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। তিনি বললেন, অস্ত্র-চিকিৎসার সময় যন্ত্রপাতিসমূহে উত্তাপ দিলেই তা' জীবাণুমুক্ত হয়।

এরপর লিস্টার লক্ষ্য করলেন, ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ সেরে উঠতে বেশ সময় লাগছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কার্বলিক এসিডের প্রতিষেধক ক্ষমতা নষ্ট

হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আর, একবার এর কর্মক্ষমতা নষ্ট হলে সেখানে আবার দূষিত জীবাণু বাসা বাঁধবে। কিন্তু কি করে কার্বলিক এসিডের প্রতিষেধক ক্ষমতা আরও অধিক দিন বাড়ানো যায়? এ নিয়ে তিনি দিবারাত্র গবেষণা চালালেন।

শীঘ্রই সে-পন্থা আবিষ্কৃত হলো। লিস্টার ক্ষতস্থানে এক প্রকার প্রলেপের ব্যবস্থা করলেন। এই প্রলেপের দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করলেন, ক্যালশিয়াম কার্বনেট, কার্বলিক এসিড আর তিসির তেল। ফলে কার্বলিক এসিডের প্রতিষেধক ক্ষমতা বহুদিনের জন্য রক্ষিত হলো। তিনি রোগীর ক্ষতস্থানকে পাতলা টিন বা অন্য কোন ধাতুর পাত দিয়ে আবৃত রাখার কথাও ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, এতেও পচনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে বেরন লিস্টারকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁর আবিষ্কারের জন্য ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি রয়াল সোসাইটির সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। এর বছর তিনেক পূর্বে লিস্টার ফ্রান্সের পাস্তুর ইনসটিটিউটের অনুরূপ ইংল্যাণ্ডেও একটি প্রতিষেধক ঔষধের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এর নাম পরিবর্তন করে লিস্টার ইন্সটিটিউট নামকরণ করা হয়েছে।

লর্ড লিস্টার সব সময়ই কথাবার্তা খুব কম বলতেন ও নেহায়েৎ প্রয়োজন ছাড়া গল্প-গুজব করা ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। কিন্তু, তাই বলে তিনি তাঁর আবিষ্কারের কথা কখনই গোপন রাখতেন না। অন্যের কাছে ঋণ স্বীকারে কখনও তিনি অপমান বোধ করতেন না। লিস্টার যেমন নিঃসঙ্কোচ চিত্তে পাস্তুরের কাছে তাঁর ঋণের কথা উল্লেখ করেছেন, বিজ্ঞান জগতের ইতিহাসে তেমন দৃষ্টান্ত খুব কমই মিলে।

১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লর্ড লিস্টারের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলেছিলেন, তাঁর শবদেহ যেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর পাশেই কবরস্থ করা হয়। কিন্তু তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি এতো বেশী ছিল যে,

জনসাধারণ তা' কিছুতেই মানতে চাইলো না। তারা বললো, মানুষের এতোবড় মহান দরদী বন্ধুর কবর কি কখনও কোন অজ্ঞাত স্থানে দেওয়া সম্ভব? তাই তারা স্থির করলো, ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য খ্যাতনামা সন্তানদের পাশেই, ওয়েস্টমিনিস্টার এবিতেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হবে। কার্যতঃ তাই করা হয়েছিল।

লিস্টার ও পাস্তুর এঁরা দু'জন ছিলেন মানুষের পরম দরদী বন্ধু। পাস্তুর দিয়েছিলেন, আলোকের সন্ধান আর লিস্টার সেই আলোর সাহায্যে অগণিত মানুষকে রক্ষা করেছেন অকাল মৃত্যুর হাত থেকে। তাই এঁদের দু'জনার সম্বন্ধে একটা বিখ্যাত কথা প্রচলিত আছে, "জগতের সমস্ত যুদ্ধে যত প্রাণ নষ্ট হয়েছে, এই দু'জন লোক তাঁর চেয়ে ঢের বেশী লোকের প্রাণ দান করেছেন।"

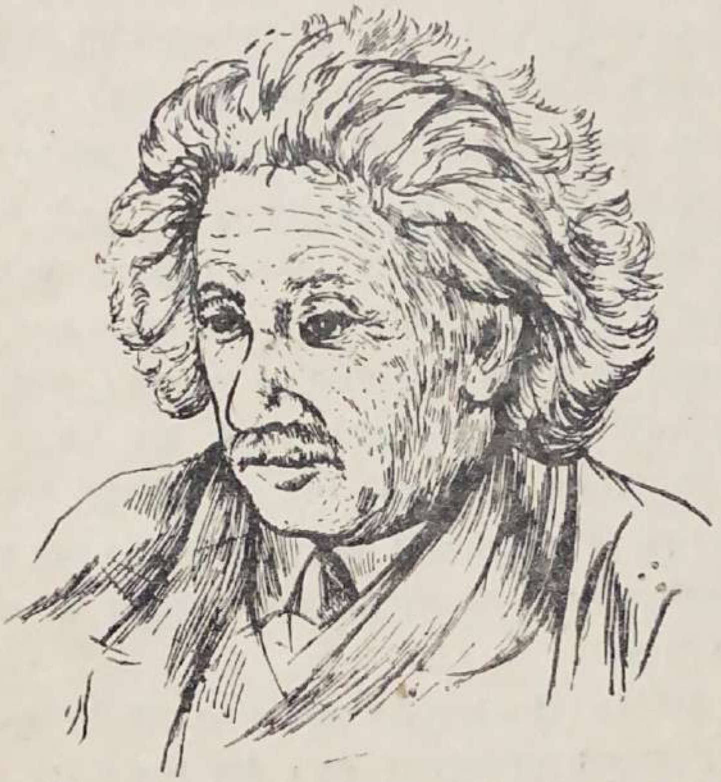

আলবার্ট আইনস্টাইন

একদিন একখানা নতুন বই হাতে পড়লো একটি ছেলের। বইখানা পড়ে কিছুই বুঝতে পারলো না সে। এর নাম লেখা রয়েছে—'এলজাবরা'। কৌতুহলী হয়ে উঠলো তার মন। সাথে সাথেই সে তার চাচাকে জিজ্ঞেস করলো—"আচ্ছা চাচা, 'এলজাবরার' অর্থ কি?" ছেলেটির চাচা ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন, "এলজাবরা একটি চমৎকার অঙ্ক বিজ্ঞান। মনে কর তোমার কাছে কোন একটা জিনিস রয়েছে; অথচ এটি সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না। তা'হলে প্রথমতঃ, এর নাম দাও এক্স। তারপর, অনেক খোঁজা-খুঁজি করে এর সম্বন্ধে সব কিছু জেনে আসল জিনিসটা কি তা' বলে দাও।" অল্পদিনের মধ্যেই এলজাবরার অঙ্কগুলো ছেলেটির কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠলো। সে বইখানার প্রায়

সব অঙ্কই শেষ করে ফেললো। তাই দেখে অঙ্কের শিক্ষক মন্তব্য করলেন, অঙ্ক শাস্ত্রে এ ছেলের জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকগণ বললেন, এর মত নিরেট বোকা ছাত্র খুব কমই দেখা যায়।

এই বোকা ছেলেটির নামই আলবার্ট আইনস্টাইন। পরবর্তীকালে তিনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী হিসেবে নাম করেছেন বিশ্ব জোড়া। সবাই তাঁর নাম দিয়েছেন—বিজ্ঞানের যাদুকর বা দ্বিতীয় নিউটন। স্যার আইযাক নিউটনের মৃত্যুর প্রায় দু' শ' বছর পরে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে নতুন বিপ্লব এনেছেন তিনি—বিজ্ঞানকে একটা সম্পূর্ণ নতুন পথে পরিচালিত করেছেন। অবশ্য এই দুই দিকপালের মধ্যবর্তীকালে বিজ্ঞান কখনও নিশ্চল হয়ে বসে ছিল না। অনেকেই বিজ্ঞানের বহু উৎকর্ষ সাধন করেছেন—আবিষ্কার করেছেন বহু নতুন নতুন তত্ত্ব। কিন্তু তাঁদের চলার পথে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল, আলবার্ট আইনস্টাইন সে-সব সমস্যার সমাধান করেছেন তাঁর আবিষ্কৃত নতুন তত্ত্বের সাহায্যে।

১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই মার্চ তারিখে দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানীর উল্‌ম নামক ছোট শহরে আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম। তাঁর পিতার নাম হরম্যান আইনস্টাইন ও মাতার নাম পলীন। তাঁদের একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির দোকান ছিল। এই দোকানের স্বল্প আয়ে তাঁদের সংসার চলতো। আলবার্ট আইনস্টাইনই ছিলেন তাঁদের বড় ছেলে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে তাঁদের চিন্তার অবধি ছিল না। কেননা, আলবার্ট ছাত্র হিসেবে মোটেই ভাল ছিলেন না। তদুপরি, তিনি কারও সাথে মিশতেন না বা খেলাধুলা করতেন না। সব সময়ই একাকী থাকতে ভালবাসতেন। তাঁর ক্লাসের অন্যান্য ছাত্ররা ও আত্মীয়-স্বজনরা এজন্য তাঁকে অসামাজিক বলে বিদ্রূপ করতো।

আলবার্টের বয়স তখন সবে পাঁচ বছর। এই সময় তাঁর পিতা ছোট একটা জিনিস কিনে আলবার্টকে উপহার দিলেন। এটি একটি কম্পাস। এই ছোট কম্পাসটি পেয়ে তাঁর আর খুশী দেখে কে। তিনি কম্পাসটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এদিকে-ওদিকে-সেদিকে করে রাখলেন। কিন্তু প্রত্যেক

বারই কম্পাসের কাঁটাটি কেঁপে কেঁপে ওই একই দিকে মুখ করে দাঁড়ালো। ঘূর্ণায়মান কাঁটাটি দেখে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন। বার বার প্রশ্ন করলেন, কোন্ শক্তির বলে কাঁটাটি ঘুরছে? সেদিনের এই প্রশ্নই পরবর্তীকালে বিশ্ব প্রকৃতির রহস্য সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসু করে তুলেছিল।

একবার আলবার্টের পিতার ব্যবসায়ে মন্দাভাব দেখা দিল। এতে তাঁদের রোজগার অনেক কমে গেল, এমনকি সুষ্ঠু ভাবে সংসার পরিচালনা করাও মুস্কিল হয়ে দাঁড়ালো। তাই তাঁরা জার্মানী ছেড়ে ইটালীর মিলান শহরে বসবাসের জন্য চলে আসেন। তখন আলবার্ট মিউনিক স্কুলের শেষ বর্ষের ছাত্র; বার্ষিক পরীক্ষার জন্য তাকে মাস কয়েক মিউনিকে থাকতে হবে। কিন্তু মিউনিক বিদ্যালয় কিছুতেই তাঁর কাছে ভাল লাগতো না। এখানকার বাঁধাধরা নিয়মকানুন তাঁর কাছে সামরিক বিদ্যালয়গুলোর মতই মনে হতো। তাই তিনি অল্পদিন পরেই মিলানে তাঁর পিতা-মাতার সাথে মিলিত হলেন। মিউনিক বিদ্যালয়ের কঠোর শাসনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ইটালীর প্রাকৃতিক শোভা তাঁকে মুগ্ধ করলো। তিনি ঘুরে বেড়ালেন এখানে-সেখানে। মাস ছ'য়েক এমনি ভাবে ঘুরে বেড়ানোর পর তিনি সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত জুরীখ পলিটেক্‌নিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

পলিটেক্‌নিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর আলবার্ট আইনস্টাইন কিছুদিন চাকুরীর সন্ধানে ঘুরলেন। কেই-বা জানতো যে সেদিনের এই চাকুরী প্রত্যাশী লোকটিই কালে জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাতি লাভ করবে? বিশ্বের মানুষ তাঁর আবিষ্কারের জন্য যুগ যুগ ধরে শ্রদ্ধার সাথে তাঁর নাম স্মরণ করবে? সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবে তাঁকে নতুন স্রষ্টা বলে? অথচ প্রথম জীবনে রুজি-রোজগারের তাগিদে এই মহান লোকটাকে কতই না দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। বহু জায়গায় দরখাস্ত করেও তিনি কোথাও চাকুরী পাননি। অবশেষে, কোন এক বন্ধুর সহায়তায় সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী বার্ন শহরে সরকারী পেটেন্ট অফিসে একটি চাকুরী লাভ করেন।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ। আলবার্ট আইনস্টাইনের বয়স তখন ২৬ বছর। পেটেন্ট অফিসের চাকুরীর ফাঁকে ফাঁকে গবেষণা করে এই সময় তিনি তিনটি গুরুত্ব-পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এগুলির একটি হচ্ছে—আলোর ফোটন-তত্ত্ব। এতে তিনি আলোর কণাধর্মিতা প্রমাণ করেন। তিনি বলেন, আলো শক্তিকণা ফোটনের সমবায়ে তৈরী। এই তত্ত্বের ফলে ফটো বৈদ্যুতিক সেল তৈরী সম্ভব হয়েছে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের এক নতুন দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছে।

আইনস্টাইনের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ছিল পদার্থ ও শক্তির অভিন্নতা সম্পর্কে। তিনি বলেন পদার্থ ও শক্তি আসলে অভিন্ন। উপযুক্ত পরিবেশে পদার্থকে শক্তিতে এবং শক্তিকে পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব। পদার্থ আসলে অত্যন্ত ঘনীভূত শক্তিপুঞ্জের সমষ্টি মাত্র। পদার্থ ও শক্তির অভিন্নতা সম্পর্কে আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণটি হচ্ছে $E=mc^2$, E হচ্ছে শক্তি, m পদার্থের ভর এবং c আলোর গতিবেগ। এই গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণটি পারমাণবিক যুগের সূচনা করেছে। পারমাণবিক শক্তি, পারমাণবিক বোমা ইত্যাদি এই তত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণ করেছে।

এই বছরে প্রকাশিত যে প্রবন্ধটি সারা দুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং আইনাস্টইনকে খ্যাতির উচ্চতম শিখরে তুলে দিয়েছে তা' হচ্ছে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হচ্ছে—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নিরপেক্ষ গতি বলে কিছু নেই। সমস্ত গতিই আপেক্ষিক অর্থাৎ কোন এক গতির সঙ্গে তুলনা করে অন্য গতিকে প্রকাশ করা হয়। মনে কর, কোন ট্রেন পঞ্চাশ মাইল বেগে ছুটে চলছে। এর আসল বা নিরপেক্ষ গতি কত তা তুমি বলতে পার কি? এই পঞ্চাশ মাইল গতিবেগ তো পৃথিবীর তুলনায়। কিন্তু ট্রেনটিকে নিয়ে পৃথিবী তো নিজ অক্ষের উপর ঘণ্টায় এক হাজার মাইল গতিবেগে ঘুরছে। আবার এই গতি ছাড়াও পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘণ্টায় প্রায় ৭০,০০০ মাইল বেগে ছুটে চলেছে। আবার সূর্য আমাদের পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ-নিয়ে পার্শ্ববর্তী নক্ষত্রসমূহের তুলনায় ঘণ্টায় প্রায়

৫০,০০০ মাইল বেগে ঘুরছে। তা'ছাড়া সেই নক্ষত্রসমূহও স্থির নেই, তাদেরও গতি রয়েছে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছুই স্থির নেই—যার সাথে তুলনা করে অন্য কোন বস্তুর নিরপেক্ষ গতি পরিমাপ করা যেতে পারে।

আলোর তরঙ্গধর্মিতা ব্যাখ্যা করবার জন্য বৈজ্ঞানিকরা আলোক তরঙ্গের মাধ্যম হিসেবে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী ইথারের কল্পনা করেছিলেন এবং মনে করা হয়েছিল যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কেবল ইথারই একমাত্র বস্তু যার কোন গতি নেই।

ইথার যদি স্থির হয় তাহলে এর তুলনায় পৃথিবীর নিরপেক্ষ গতি পরিমাপ করা সম্ভব। এ থেকেই অনুমান করা হলো যে শান্ত ইথার সমুদ্রে পৃথিবীর গতির জন্য যে স্রোত সৃষ্টি হবে তার ফলে এই স্রোতের দিকে এবং এর আড়াআড়ি দিকে আলোর গতিবেগের তারতম্য হবে। কিন্তু মাইকেলসন এবং মর্লি নামক দু'জন আমেরিকান বিজ্ঞানীর পরীক্ষায় দেখা গেল আলোর গতিবেগের কোন পার্থক্যই ধরা পড়ে না। এর ফলে ইথার মতবাদের ভিত্তি টলে উঠলো। এই পরীক্ষাটি থেকে আইনস্টাইন তার আপেক্ষিকতত্ত্বের প্রেরণা পান। তিনি বলেন, ইথার বলে কিছু নেই, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোন স্থির বস্তু নেই, কাজেই নিরপেক্ষ গতিবেগের চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। আইনস্টাইন বলেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের গতির এই আপেক্ষিকতার মধ্যে কেবল একটি গতিই অপরিবর্তনীয় তা' হচ্ছে আলোর গতি। যে-কোন পরিবেশেই আলোর গতিবেগ পরিমাপ করা হোক না কেন তা সব সময়ই এক থাকবে।

স্থান এবং কালের মাত্রা বিভিন্ন পরিবেশে বেড়ে বা কমে গিয়ে আলোর গতিবেগকে অপরিবর্তনীয় রূপে রাখে। এই প্রসঙ্গে আইনস্টাইন চতুর্মাত্রিক বিশ্বের কথা বলেন। তিন মাত্রিক স্থানের সাথে 'কাল'কে এক করে দেখা না হলে কোন ঘটনার যথার্থ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। 'কালের' 'স্থান' থেকে আলাদা কোন সত্তা নেই। 'এই মুহূর্ত' 'এখন' ইত্যাদি কথা স্থানের সাথে যুক্ত না হলে কোন অর্থই নেই। কোন নক্ষত্রকে এখন পৃথিবী থেকে যে অবস্থায় দেখছি সেটা হয়ত সেই নক্ষত্রের তিরিশ, চল্লিশ বছরের

আগের অবস্থা, কেননা ওই নক্ষত্র থেকে যে আলো আসছে যার সাহায্যে আমরা নক্ষত্রটিকে দেখছি তা' পৃথিবীতে পৌঁছাতে ঐরূপ কয়েক বছর কেটে গেছে। কাজেই পৃথিবীর এই মুহূর্ত এবং নক্ষত্রের এই মুহূর্ত এক নয়। আইনস্টাইন তাই বলেন যে, কোন ঘটনার যথার্থ বিবরণ দিতে গেলে স্থান ও কালকে এক করে দেখতে হবে। আমাদের বিশ্বজগৎ চতুর্মাত্রিক।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইন তাঁর সার্বিক আপেক্ষিক-তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এতে নিউটনের মহাকর্ষ-তত্ত্বটিকে সংশোধন করা হয়েছে। তিনি বলেন, মহাকর্ষ-শক্তি বলে আসলে কিছু নেই। চতুর্মাত্রিক দেশ-কালের পরিসরে জড় পদার্থের চারপাশে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তারই ফলে সব পদার্থ আপনা-আপনি সহজ পথে চলতে থাকে। এই সহজ পথটা আসলে বক্রপথ; পাহাড়ে উঠবার সহজ উপায় যেমন পাহাড়ের চারপাশে ঘুরে ঘুরে ওঠা। আইনস্টাইনের এই ধারণা অত্যন্ত বৈপ্লবিক। এর ফলে আমাদের অতি পরিচিত ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ধারণাকেই বদলে দিতে হয়েছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক-তত্ত্ব সম্পর্কে তোমরা বড় হয়ে অনেক জানতে পারবে।

ভূবন বিশ্রুত বিজ্ঞানী হিসেবে আলবার্ট আইনস্টাইনের খ্যাতি ইতিমধ্যেই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে বহু আমন্ত্রণ পত্র আসতে লাগলো। এসব আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তিনি যেখানেই উপস্থিত হলেন, সেখানেই জমলো অগণিত লোকের ভীড়। কোন কোন স্থানে লোকের ভীড় এতো বেশী বেড়ে গেল যে বক্তৃতা দেওয়ার হলঘরগুলোতে স্থান সঙ্কুলান হলো না—অনেকেই বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনলো। কেউবা অইনাস্টাইনকে এক ঝলক দেখার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে রাজপথে দাঁড়িয়ে রইলো।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞান জগতে অমর অবদানের জন্য আলবার্ট আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন ঢিলে-ঢালা পোশাক পরিহিত আড়ম্বরহীন একজন অতি সাধারণ লোক। নির্বিকার চিত্তে কঠোর পরিশ্রমে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি

তিনি সব সময়ই উদাসীন ছিলেন। বাইরের চাকচিক্যের কোন অর্থই খুঁজে পেতেন না তিনি। অবশ্য এজন্য অনেকেই তাঁকে দেখে হাসতো; কেউবা পত্র-পত্রিকায় ঢিলে-ঢালা পোশাক পরিহিত আইনস্টাইনের ছবি দেখে বলতো, 'এই মোটা মুখ আর অদ্ভুত নাকওয়ালা লোকটাই কি ভূবন বিখ্যাত বিজ্ঞানী—আইনস্টাইন?'

আলবার্ট আইনস্টাইন একজন নিতান্ত সাধারণ নাগরিকের ন্যায় জীবন যাপন করতে ভালবাসতেন। কেউ কখনও তাঁকে কোন বিশেষ সুবিধা দিতে চাইলেও তিনি তা' নীরবে প্রত্যাক্ষাণ করতেন। একবার প্যারিসে বিজ্ঞানীদের একটি সভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সময়মত প্যারিসের পথে রওনা দিলেন। যথাসময়ে স্টেশনে ট্রেন থামলো। তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য যারা এসেছিলেন—তারা সবাই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আইনস্টাইনকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। অবশেষে অনেকেই ভাবলেন, তিনি হয়ত বিশেষ কোন কারণে উপস্থিত হতে পারেননি। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরা থেকে নীরবে নেমে একজন লোক সোজাপথে সভাস্থলের দিকে হাঁটা দিয়েছেন। ইনিই হলেন—ভূবন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ আলবার্ট আইনস্টাইন।

সঙ্গীত ছিল আলবার্ট আইনস্টাইনের খুব প্রিয় জিনিস। তিনি নিজেও ভাল বেহালা ও পিয়ানো বাজাতে জানতেন। এ বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। একবার বেলজিয়ামের রাজা ও রাণী কানসার্টে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁদের সাথে আইনস্টাইনের আগে থেকেই বন্ধুত্ব ছিল। তাই তিনি রাজা ও রাণীর এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বেলজিয়ামের পথে রওনা দিলেন। সময়মত রক্ষীসহ বড় বড় রাজ-কর্মচারীরা গাড়ী নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য হাজির হলো। ট্রেন এসে স্টেশনে থামলো। রাজ-কর্মচারীরা প্রথম শ্রেণীর কামরায় আইনস্টাইনকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। অবশেষে অতিথির দেখা না পেয়ে বিষণ্ন মনে তারা রাজদরবারে ফিরলো। তারা

খবর দিল, 'আইনস্টাইন আসেননি'। কিন্তু তখনই দেখা গেল ময়লা কাপড় পরিহিত একজন লোক রাজ-দরবারে এসে হাজির হলেন। তিনি নিজেকে আইনস্টাইন বলে পরিচয় দিলেন। একথা শুনে সবাই ত' হতবাক! রাণী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের গাড়ীতে আপনি এলেন না কেন?' এ কথার উত্তরে তিনি বললেন, 'হেঁটে আসতে আমি অনেক আনন্দ পেয়েছি।'

আলবার্ট আইনস্টাইন ছিলেন নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা বিজ্ঞানী। অসত্য আর অন্যায়কে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে হিটলার জার্মানীর শাসনভার গ্রহণের পর ইহুদীদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার চালায়, আইনস্টাইন এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এজন্য কেউ কেউ তাঁকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যা দিয়েছিল। কোন কোন খবরের কাগজওয়ালা তাঁকে দেশের দুশমন বললো। আইনস্টাইন তাদের এসব অপবাদের কোনই গুরুত্ব দিলেন না। কিন্তু তাঁর প্রতি নাৎসী সরকারের শত্রুতা যখন আরও বেড়ে গেল, তখন তিনি জার্মানীর নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ার জন্য মনস্থির করলেন। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে তিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং স্থায়ীভাবে প্রিন্সটনের ইনস্টিটিউট অব এ্যাডভান্স স্টাডিতে গণিত বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন।

মহামনীষী আলবার্ট আইনস্টাইন ছিলেন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার একজন মহান সংগ্রামী সৈনিক। যুদ্ধ-বিগ্রহকে তিনি ঘৃণা করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মানবতার অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা দেখে তাঁর বিজ্ঞানী-মন দরদে কেঁদে উঠেছিল। তাই তিনি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বিশ্বের সবার কাছে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বহু রাজনৈতিক সংস্থার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।

আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক, বিংশ শতাব্দীর নিউটন, মানবতার পরম দরদী বন্ধু, বিশ্বশান্তির সংগ্রামী সৈনিক ও নতুন যুগের স্রষ্টা ডঃ আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মহাপ্রয়াণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ছিয়াত্তর বছর।

অধ্যাপক হলডেন

দুপুর বেলা। মিসরের প্রখর সূর্যকিরণে উপর থেকে যেন আগুনের হল্কা ঝরে পড়ছে। তারই মধ্যে একজন দুঃসাহসী লোক প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বসে রয়েছেন। গায়ে কোন কাপড় নেই। সামনে এক গামলা পানি। মাঝে মাঝে গামলা থেকে পানি নিয়ে মাথায় এবং শিরদাঁড়ায় ঢালছেন, কি এক অদ্ভুত নেশা! মুখে তাঁর ক্লান্তির লেশমাত্র নেই। পরিণামের কথাও তার চিন্তার বাইরে। নিজ সঙ্কল্পে তিনি অচল ও অটল। তিনি প্রমাণ করতে বসেছেন যে, সরাসরি সূর্যরশ্মি থেকে 'আকস্মিক উত্তাপের যন্ত্রণা' উৎপন্ন হয় না। এটা মাস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডের অতিরিক্ত উত্তপ্ততার ফলেই হয়ে থাকে।

ইনিই অধ্যাপক জে. বি. এস. হলডেন। তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত জীববিজ্ঞানী। অবশ্য বিজ্ঞান বিষয়ে জনপ্রিয় লেখক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে দুনিয়া জোড়া। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের সব বিভাগের সাথে সাধারণ মানুষের পরিচয় ঘটাবার দুরূহ কাজে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন, হলডেন তাঁদের পুরোধা। তাঁর মতে, 'আজকের সমাজব্যবস্থায় বিজ্ঞানীদের কর্তব্য হলো সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করা, আর সাধারণ মানুষেরও কর্তব্য বিজ্ঞানকে বুঝতে চেষ্টা করা।'

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর জন বাউন স্যাণ্ডারসন হলডেন অক্সফোর্ডের চারওয়েলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জন স্কট হলডেন। তিনিও তদানীন্তন কালের একজন বিখ্যাত শরীরতত্ত্ববিদ ছিলেন। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে হলডেন ইটন থেকে বৃত্তি পেয়ে অক্সফোর্ডের নিউ কলেজে প্রবেশ করেন এবং অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স সহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি হিউমানিটিজে ডিগ্রী লাভ করেন। মেধাবী ছাত্র হিসেবে শিক্ষক ও ছাত্র মহলে তাঁর অনেক খ্যাতি ছিল।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিউ কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন। তথায় তিনি শরীরবিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দান করেন এবং গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

এই সময় তিনি প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম নির্বাচনের গাণিতিক তত্ত্বের উপর সর্বপ্রথম ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে তিনি "দি কলেজ অব ইভ্যালুএশন" গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনিই সর্বপ্রথম মানব জাতির পরিবর্তনের গতি সম্পর্কিত ধারণা প্রকাশ করেন। অধ্যাপক হলডেন সাইটোকোম অক্সিডেজ নামক দ্রব্যটি আবিষ্কার করেন। এটা অঙ্কুরোদ্গত উদ্ভিদ, মথ এবং ইঁদুরের মধ্যে পাওয়া যায়।

জীবনকে তুচ্ছ করে নিজের শরীরের উপর বিজ্ঞানের বহু দুরূহ পরীক্ষা-কার্য পরিচালনার লোমহর্ষক কাহিনী অধ্যাপক হলডেনের জীবনে বিরল নয়। সম্ভবতঃ তিনি ছোটবেলায় তাঁর পিতার কাছ থেকে এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরতত্ত্বের অধ্যাপক জন স্কট হলডেন প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণের জন্য অঙ্গার অম্লজ নামক এক প্রকাশ বিষাক্ত গ্যাস এক ঘণ্টারও অধিক সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে গ্রহণ করেছিলেন। আর একবার তিনি ১৬৬° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপের একটি চুল্লির-মধ্যে কিছুক্ষণ বসেছিলেন এবং শরীরের উপর এর তীব্র প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন। শিশু বাউনকে নিয়েও তিনি বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। বাউনের বয়স যখন মাত্র চার বছর তখন তাঁর পিতা একবার তাঁকে কয়লার খনি এবং গভীর নর্দমার মধ্যে নিয়েছিলেন। তিনি এই ছোট শিশুর উপর মিথেন নামক এক প্রকার গ্যাসের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। এমনিভাবে ছোটবেলা থেকেই ব্রাউনের জীবনে নিজের শরীরের উপর পরীক্ষাকার্য পরিচালনার খেয়াল সংক্রমিত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অধ্যাপক জে. বি. এস. হলডেন সৈন্য দলে ভর্তি হন এবং ইরাক ও ফ্রান্সে কাজ করতে থাকেন। এই যুদ্ধে তিনি দু'বার

আহত হয়েছিলেন এবং আহত অবস্থায় ভারতের পুণা সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেন। এই সময় তিনি অপর একটি দুঃসাহসিক পরীক্ষাকার্য চালান। নিজের শরীরে টাইফয়েড ইনজেকশন দিয়ে তার গুণাগুণ পরীক্ষা করেন এক অদ্ভুত উপায়ে। ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি ডোবার অফুটন্ত পানি গ্রহণ করেন এবং রাস্তার ধারের কলুষিত দোকানের 'পান' চিবান। ফলে তিনি এক প্রকার জ্বরে আক্রান্ত হন। 'টাইফয়েড' না হলেও এই জ্বর টাইফয়েড অপেক্ষা কম যন্ত্রণাদায়ক নয়। কিন্তু তিনি হাসিমুখে এই যন্ত্রণা উপভোগ করেছেন।

অধ্যাপক হলডেন ছিলেন জ্ঞান অন্বেষণের দুরন্ত পথিক। তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করলে একথা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণের জন্য তিনি নিজের জীবনের মূল্যবোধ সব সময়ই অবজ্ঞা করেছেন। লেখার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সাথে একাত্ম হওয়া, বিস্ময়কর আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে দুঃসাহসিক বহু চমকপ্রদ ঘটনাবলী নিয়েই তাঁর জীবন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এরূপ বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্তই বিরল।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে অধ্যাপক হলডেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে রীডারের পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি এই পদে দীর্ঘ ১০ বছর কাজ করেন। তারপর তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজনন বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং এই বিভাগে দীর্ঘ ২০ বছর অধ্যাপনা করেন। জীববিদ্যায় গবেষণার জন্য তিনি ডারউইন, ওয়েলস্, মার্কিন জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমী, ধর্মযাজক একাডেমী সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মানজনক স্মরণীপদক লাভ করেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়েই অধ্যাপক হলডেন নিজেকে সীমিত করেননি। আজীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন তিনি। রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ১৯৩০

খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে জার্মানীতে হিটলারের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের তিনি কঠোর সমালোচনা করেছিলেন এবং বহু উদ্বাস্তুকে রক্ষা করেছিলেন। যুদ্ধের নামে ব্যাপক গণহত্যাকে তিনি মন-প্রাণ দিয়ে ঘৃণা করতেন।

১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে সুয়েজ খাল সঙ্কটে বিক্ষুব্ধ হয়ে তিনি মাতৃভূমি ত্যাগের ইচ্ছা পোষণ করেন। এই ঘটনাকে তিনি 'পোর্ট সৈয়দে গণহত্যা' বলে অভিহিত করেন। পরের বছর তিনি ভারতে চলে আসেন এবং কলিকাতার সংখ্যাতত্ত্ব ইনস্‌টিটিউটে প্রধান গবেষক হিসেবে যোগ দেন। এবং চার বছর ওই পদে বহাল থাকেন। এরপর তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-গবেষণা পরিষদের প্রজনন এবং প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভুবনেশ্বরের জীববিদ্যা ও প্রজনন গবেষাণগারের পরিচালক নিযুক্ত হন। তাঁর পত্নী ডঃ হেলেন স্পারওয়েও তাঁর সাথে গবেষণা করতেন।

১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে অস্ত্রোপচারের উদ্দেশ্যে লণ্ডন গমন করেন। একদা তিনি বলেছিলেন, "যদি কাউকে ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে হয় তবে সে মানুষটি আমি হলেই সুখী হই। এটা আমাকে তেমন বিব্রত করবে না, বরঞ্চ তা' আমার কাছে উপভোগ্যই হবে।" তাই তিনি শয্যাশায়ী অবস্থায় অসহায়ের ন্যায় মৃত্যুর দিন গুণেননি; উপরন্তু এই অসহ্য রোগযন্ত্রণাকে উপভোগ করেছেন। এই সময় তিনি একটা সুন্দর কবিতা রচনা করেন। তাঁর কবিতাটি লণ্ডনের 'নিউ স্টেট্‌স-ম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এতে তিনি লিখেছিলেন, "একটুখানি হাসি প্রায়শই আরোগ্যলাভকে ত্বরান্বিত করে বলেই আমার বিশ্বাস।"

কিন্তু 'হাসি' তাঁকে শেষ পর্যন্ত আট্‌কে রাখতে পারেনি। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে ভারতের ভুবনেশ্বরে এই বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭২ বছর। জ্ঞানান্বেষণের এই দুরন্ত পথিক চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক গবেষণার জন্য জীবদ্দশাতেই নিজের মৃতদেহ উৎসর্গ করেছিলেন। তাই মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর দেহ মেডিকেল কলেজে প্রেরণ করা হয়েছিল।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় অধ্যাপক হলডেনের অসংখ্য প্রবন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে। তা'ছাড়া তিনি সাধারণ মানুষের জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় বিশখানা বই লিখেছেন। তাঁর মৃত্যুর ফলে বিজ্ঞান জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। তাঁর মত প্রতিভাবান দুঃসাহসী বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা আধুনিক জগতে নিতান্তই বিরল।